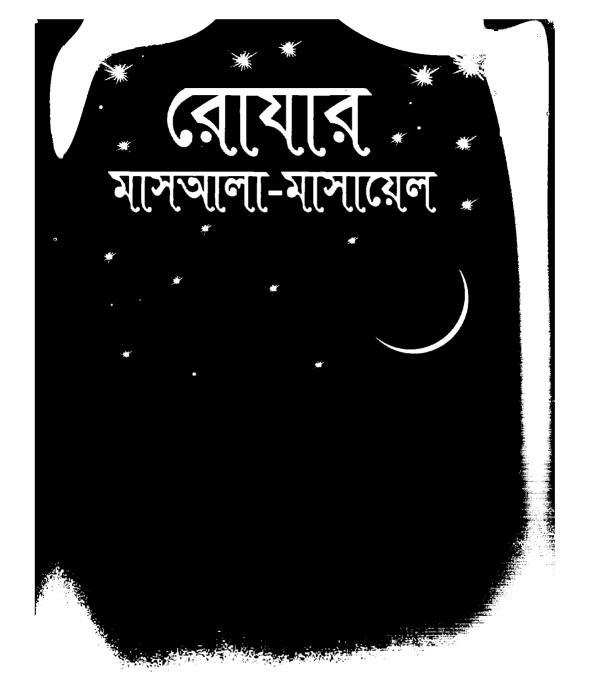


रुमलाभिक काउँ एउभन



ইসলামিক ফাউভেশন

রোযার মাসআলা-মাসায়েল

সম্পাদনা পরিষদ



রোযার মাসআলা-মাসায়েল

সম্পাদনা পরিষদ

ইফা প্রকাশনা : ২৩৪৬/৩

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৫৩

ISBN: 984-06-01012-X

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৫

চতুর্থ সংস্করণ

জুলাই ২০১১

শ্রাবন ১৪১৭

শাবান ১৪১৩

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্বদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোন্তফা কামাল

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন: ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ: শব্দরূপ

মুদ্ৰণ ও বাঁধাই

মোঃ আইউব আলী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউভেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

মৃশ্য : ৩৬.০০ টাকা

ROZAR MASALA-MASAEL (Propositions of Fasting): Compiled and edited by Editorial Board and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone: 8181538

July 2011

E-mail: islamicfoundation bd @ yahoo. com. Website: www. islamicfoundation. org. bd.

Price: Tk. 36.: US Dollar: 1.00

সূচিপত্র প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্লোযা

রোযার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি রোযা ও রমযান মাস সম্পর্কীয় পরিভাষা	
	•
রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ď
	٩
	Ŕ
<u> </u>	0
	د
	۲)
	٤১
	۲۶
	৻ঽ
	৩
	হত
	ঽ৩
ফর্য রোযা	8
ওয়াজিব রোযা	₹8
	₹8
নফল রেয়া	ঽ৽
আন্তরার রোযা	২৭
	২৮
	২১
	৩০

[፮'፫]

,	
সাওমে দাউনী	೨೦
সাওমে বিদাল	৩০
রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিনসমূহ	٥٥
মাকরহ রোযা	৩১
	0,2
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রোযা ভঙ্গের কারণ এবং কাযা ও কাফ্ফারা	
যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং ওধু কাযা ওয়াজিব হয়	৩২
যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং কামা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়	90
যে সব কারণে রোফা ভঙ্গ হয় না	৩৬
রোযা অবস্থায় যে সব কাজ মাকরহ	Sò
রোযা অবস্থায় যেসব কাজ ম্যুক্ত্রহ নয়	৩৯
যে সব ওযরে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয	৩৯
যে সব কারণে রোফা না রূপা জায়েয	80
'ইয়াওমুশ্ শক্'-এ রোযা রাখার হুকুম	8 २
কাযা রোযা	88
রোযার কাফ্ফরা সম্পর্কিত মাসাইল	-8¢
ফিদ্যার মাসা ইল	8৬
মুসাফিরের রোযা	89
রুণ্ন ব্যক্তির রোযা	8br
মাযূর ব্যক্তির রোযা	8 ৯
অতি বৃদ্ধের রোযা	৪৯
গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারিণী মহিলার রোয়া	৪৯
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ও ডুস গ্রহণ	¢o
রেয়া অবস্থায় মাজন বা প্রেস্ট ব্যবহার করা	(°)
রোযা অবস্থায় রক্ত দান অথবা রক্ত গ্রহণ	_
রোযা অবস্থায় অপারেশন	.00
ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার	دی
রোযা অবস্থায় দাঁত সংযোজন এবং ঔষধ ব্যবহার	
কতিপয় জরুরী মাসাইল	<i>ઉ</i> ર
	@ 2

তৃতীয় পরিচ্ছেদ চাঁদ দেখা

্ চাঁদ দেখার গুরুত্ব	৫৩
রোহা ও ঈদের চাদ দেখা	৫৩
চান নেখার উপর রোমা ও ঈদের নির্ভরশীলতা	89
চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া	89
আকাশ মেঘাস্থ্য থাকা অবস্থ্য়ে রমযানের চাঁদ দেখার বিধান	99
আকাশ মেঘাচ্ছনু না থাকা অবস্থায় রম্যানের চাঁদ দেখার বিধান	৫৬
আকাশ মেঘাচ্ছন থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চান নেখার বিধান	৫ ٩
অকাশ মেঘাচ্ছনু না থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান	ઉ ৮
ঈুদুল আয়হা ও অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বিধান	<i>ব</i> ১
কারো চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের প্রত্যয়নে সাক্ষ্য প্রদান	<i>ক</i>
চঁদ দেখার সাক্ষা গ্রহণযোগ্য না হলে	৬১
চাঁদ নেখার খবর ঘোষণা এবং এ জন্য আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার	৬২
চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান	৬২
চাঁদ নেখার সাক্ষ্য প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান	৬২
আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক চাঁদের ফয়সালা প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান	৬৩
ইখ্তিলাফে মাতালি -এর হতুম	৬8
সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা রাখা ও ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গে	৬৫
অমুসলিম দেশ থেকে প্রপ্তে চাঁদ নেখার ২বর	৬৫
জ্যোতির্বিদ ও আবহাওয়াবিদনের হিসাবে চন্দ্রোদয় নির্ণয়	৬৬
বিভিন্ন দেশে সফর করার ফলে রোয়া ত্রিশ দিনের অধিক বা উনত্রিশ দিনের ক	ম
হওয়া প্রসঙ্গে	96
যেখানে চাঁদ কখনো দেখা যায় না সেখানে রোযার হুকুম	৬৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
সাহ্রী ও ইফ্তার	
সাহ্রীর ফ্যীলত	৬৭
সাহরীর সময় ও অ'দাব	৬৭
সংহ <u>রী সম্পর্কিত মাসাইল</u>	હેર
ইফ্ডারের ফ্যীলত	90

[ছয়]

ইফ্তারের সময়	90
ইফ্তারের আদাব	۷۶
ইফ্তারের দু'আ	49
ইফ্তার করানোর ফযীলত	<i>د</i> و
ইফতার সম্পর্কিত মাসাইল	۲P
ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইফ্তার করা	৭২
বিলম্বে ইফ্তার করা	ঀঽ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
ই'তিকাঞ্চ	
ই'তিকাফের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও স্থান	৭৩
ই'তিকাফের ফযীলত ও উপকারিত:	98
রমযানে ই'তিকাফের ফযীলত ও গুরুত্ব	ዓ৫
ই'তিকাফের প্রকারভেদ ও চ্কুম	৭৬
ই'তিকাফের শর্তাবলী	৭৬
ই'তিকাফের নিয়ম	99
ই তিকাফের আদাবসমূহ	96
যে যে কারণে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়	ዓ ৯
ই'তিকাফকারীর জন্য জায়েয কাজসমূহ	ዓ ৯
ই'তিকাফকারীর জন্য নাজায়েয় কাজসমূহ	ьо
ই'তিকাফকারীর জন্য জুমু'আর সালাতে অংশগ্রহণ	po
ই'তিকাফকারীর জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ	62
যে সব কারণে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারেন	۲۵
ই'তিকাফ ফাসিদ হলে ভার হুকুম	۲۶
লাইলাতুল কাদ্রের ফয়্রীলত ও তাৎপর্য	৮৩
লাইলাতুল কাদ্রের আমল	৮ 8

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ নি'আমত। ইসলামেন বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সফলতা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই নিহিত। ইসলামী পয়গামের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা)-এর সুনাহ্। অতঃপর রয়েছে কুরআন ও সুনাহ্র আলোকে ইজমা-কিয়াস তথা ইজতিহাদের ধারা। বস্তুত কুরআন, সুনাহ্ ইজমা ও কিয়াস এ চারটিই হলো শরী আতের মৌল দলীল। ইসলামী ফিকহ্র যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত ফয়সালা উপরোক্ত দলীল চতুষ্টয়ের আলোকেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

মুসলমান হিসেবে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানা সকলের জন্যই আবশ্যক। তা ছাড়া কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু নতুন জিজ্ঞাসা ও বর্তমান সমাজে উপস্থিত। সাধারণত ফিকহ্বিদ আলিমগণ যুগে যুগে এ ধরনের নতুন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে আসছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ পর্যায়ে বড় ধরনের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

এ প্রেক্ষিতেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'জরুরী ফাতাওয়া' ও মাসাইল' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম ও ফকীহ্গণের সমন্বয়ে এই প্রকল্প কমিটি গঠিত হয়। ছয় খণ্ডে এই প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। পাঠকমহলে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। সুধী পাঠক মহলের প্রত্যাশা অনুযায়ী বইটি পরে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে ছোট কলেবরে প্রকাশ করা হয়।

এবার বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি পূর্বের মত এবারও বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

> সামীম মোহাম্মদ আফজ্ঞাল মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

একজন মুসলিম হিসেবে আমানের জীবনের প্রতিটি কাজ কুরআন ও সুনাহর আলোকে, ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান অনুসারে সম্পাদন করা আবশাক। তাই শরী'আতের মাসআলা-মাসায়েল জানা থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই একান্ত জরুরী।

আল-কুরআন এবং কুরআনের স্যাখ্যারূপ আল-হাদীসই মানব জাতির জীবন বিধান। সকল মানুষের পচ্চে শরী আতের সকল বিধি-বিধান বেঝা ও সে অনুসারে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। রাসূল আকরাম (সা)-এর জীবদশায় শরী আতের বিষয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে সাহ্যবায়ে কিরাম মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে সরাসরি তা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে সনের যুগে কুরআন-হালীস ও ইসলামী শরী আভ বিষয়ে যাঁরা অধিকতর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন তাঁরাই মুসলমানদের জীবন যাপনের অপরিহার্য প্রয়োজনে কুরআন-হাদীসের আলোকে শরী আতের বিধি-বিধান ও ফাতওয়া প্রদান করতেন গ পরবর্তীতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষত ইমাম আয়ম আনু হানীফা (র), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র), ইমাম শাফে স্ট (র) ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) সহ প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমাম ব্যাপক গবেষণা ও পুজ্বানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী শরী আতের বিধি-বিধান নির্ণারণ করে দেন। তাঁদের এই অনন্যসাধারণ ইজতিহাদ-কর্মের ফলে মুসলমানগণ জীবনের যে কোন সমস্যা ও জিল্ঞাসার শরী আতসম্মত সদ্তর পাওয়ার সুযোগ লাত করেন।

শরী আতের বিধি-বিধান সম্বলিত ফিকহ্ ও মাসায়েলের প্রায় সব গ্রন্থই আরবী ভাষায় রচিত। কাজেই বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশবরেণ্য আলিমগণের সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে ফাতাওয়া ও মাসাইল' শিরোনামে গবেষণা বিভাগ বৃহৎ কলেবরে (ছয় খণ্ডে) গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী ফিক্হর অনুসারী। তাই এ প্রস্থে হানাফী ফিক্হর অভিমতেরই প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ প্রস্থের কোন কোন রায় অন্য ফিক্হর অনুসারীদের জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ ধরনের মানাইলের ক্ষেত্রে পাঠকগণের প্রতি নিজ ফিক্হর নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার প্রস্থ দেখে নেওরার অনুরোধ রইলো

় ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন এ বিশাল কর্মটিকে বিষয়ভিত্তিক করে ছোট ছোট কলেবরে প্রকাশের জন্য সুধী পাঠকবর্গের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে অনুরোধ আসায় তাঁদের প্রত্যাশা পূরণার্থে পরে এটি ১৭টি বিষয়ে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করা হয়।

আমরা আগ্রহী পাঠকগণের নিক্ট নতুনভাবে 'রোযার মাসআলা-মাসায়েল' শিরোনামের এ বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে জানাই অশেষ শুক্রিয়া।

আল্লাহ আমাদের সকল ওভ প্রচেষ্টা কবৃল করুন আমীন!

আৰু হেনা মোস্তফা কামাল পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন



প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযা

রোযার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

'রোহা' শব্দটি ফার্সী। এর আরবী শব্দ হলো 'সাওম'। 'সাওম' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত সহকারে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোযা বলা হয় (অলমগীরী ও কাওয়াইদুল ফিকহ্)

বন্তুত রোষা রাখার বিধান সর্বযুগে ছিল। হযরত আদম (আ) থেকে ওরু করে অথিরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের যুগেই রোষার বিধান ছিল। এনিকে ইংগিত করেই আল-কুরআনে ইংশাদ হয়েছে ঃ

ياَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الْذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ـ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়া হাসিল করতে পার (২ ঃ ১৮৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আল্সী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ 'রহল মাআনী তে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে مَنْ قَبْلُكُمْ শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আ) হতে তরু করে হযরত ঈসা (আ)-এর হুগ পর্যন্ত স্কল যুগের মানুষকে বুঝানো হয়েছে। এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রোযা কেবল আমাদের উপরই ফর্ম করা হয়নি বরং হয়রত আদম (আ)-এর হুগ হতেই চলে এসেছে।

অন্যান্য তাফসীর বিশারদও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। শায়পুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হালান (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

"রোযার হুকুম হয়রত আদম (আ)-এর যুগ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে" (ফাওয়াইদে উসমানী)। তবে হযরত আদম (আ)-এর রোযার ধরন কেমন ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। আল্লামা ইমাদৃদ্দীন ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার বিধান ছিল। পরে রমযানের রোযা ফর্য হলে তা রহিত হয়ে যায়। হযরত মু'আয়, ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস, আতা, কাতাদা এবং যাহ্হাক (রা)-এর মতে মাসে তিনদিন রোযা রাখার বিধান হযরত নূহ (আ)-এর যুগ হতে তরু করে নবী ক্রীম (সা)-এর যামানা পর্যন্ত করে দেন।

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে ঃ

'যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল' বলে যে তুলনা করা হয়েছে তা তথু ফরয হওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। যদিও নিয়ম এবং সময়ের দিক থেকে তাদের এবং তোমাদের রোযার মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। অথবা নিয়ম এবং সময়ের দিক থেকেও এ তুলনা প্রযোজ্য হতে পারে। তাই বলা হয় য়ে, কিতাবীদের উপরও রময়ানের রোযা ফরম ছিল। তারা তা বর্জন করে বছরে ঐ একদিন উপবাসব্রত পালন করে য়ে দিন ফির'আউন নীলনদে নিমজ্জিত হয়েছিল। এরপর খৃষ্টান সম্প্রদায়ও উক্ত দিনে রোযা রাখে। অবশ্য তারা এর সাথে আগে-পিছে আরো দুইদিন সংযোজন করে নেয়। এভাবে বাড়াতে তারা রোযার সংখ্যা পঞ্চাশের কোটায় পৌছিয়ে দেয়। গরমের দিন এ রোযা তাদের জন্য দুঃসাধ্য হলে তারা তা পরিবর্তন করে শীতের মৌসুমে নিয়ে আসে।

মুগাফ্ফাল ইব্ন হানযালা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল্ব্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপর রমযানের একমাস রোযা ফর্য করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের জনৈক বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা এ মর্মে মানত করে যে, আল্লাহ্ তাঁকে রোগমুক্ত করলে রোযার মেয়াদ আরো দশ দিন আমরা বাড়িয়ে দেব। এরপর পরবর্তী বাদশাহর আমলে গোশত খাওয়ার কারণে বাদশাহর মুখে রোগব্যাধি দেখা দিলে তারা আবারো মানত করে যে, আল্লাহ্ যদি তাকে সুস্থ করে দেন তবে আমরা অতিরিক্ত আরো সাতদিন রোযা রাখব। তারপর আরেক বাদশাহ সিংহাসনে সমাসীন হয়ে তিনি বললেন, তুনদিন আর ছাড়বো কেন ? এবং তিনি এ-ও বললেন যে, এ রোযাগুলো আমরা বসন্তকালে পালন করব। এভাবে রোযা ত্রিশের সংখ্যা অতিক্রম করে পঞ্চাশের কোটায় পৌছে যায় (রহুল মা'আনী, ২য় খণ্ড)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন ?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শক্রের

কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মৃসা (আ) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মৃসার অধিক হকদার। এরপর তিনি এ দিন পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন (বুখারীঃ সাওম অধ্যায়)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মৃসা ও হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁনের উম্মাতগণ সকলেই সাওম পালন করেছেন।

নবীগণের মধ্যে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবদুরাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সবসময় রোষা রাখ এবং রাতভর নামায় আদায় কর। আমি বললাম জী, হাঁয়। তিনি বললেন ঃ তুমি এরূপ করলে তোমার চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি সারা বছর রোষা রাখল সে যেন রোষাই রাখল না। (প্রতি মাসে) তিনদিন রোষা রাখা সারা বছর রোষা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি রাখার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি 'সাওমে নাউদী' পালন কর। তিনি একদিন রোষা রাখাকেন আর একদিন হেড়ে দিতেন। (ফলে তিনি দুর্বল হতেন না) এবং যখন তিনি শক্রের সমুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না (বুখারী ঃ সাওম অধ্যায়)।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত দাউদ (আ)-ও সিয়াম পালন করেছেন। মোটকথা হযরত আদম (আ)-এর যুগ থেকেই রোযা রাখার বিধান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আদর্শচ্যুত হয়ে লোকেরা আল্লাহর বিভিন্ন বিধানকে যেভাবে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছিল অনুরূপভাবে রোযার মধ্যেও ভারা এমন সব পরিবর্তন করেছিল যাতে রোযার ধর্মীয় তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য শেষ হয়ে একটি নিছক প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

এহেন অবস্থা হতে রোযাকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং একে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের ধারক বানানোর নিমিত্তে মহান রাব্ধুল আলামীন দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসের রোযাকে এ উত্মাতের উপর ফর্য করে দেন।

ইরশাদ করেনঃ

ياَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়া হাসিল করতে পার (২ ঃ ১৮৩)।

আরো ইরুশাদ হয়েছে ঃ

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيَنتٍ مَنَ الْهُدى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصِمُهُ _

রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সংপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে (১ ঃ ১৮৫)।

ইসলাম অন্যান্য ইবাদতের মত রোষার মধ্যেও বেশ কিছু মৌলিক ও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেছে। সমাজের সর্বস্তরে এ সুদুর প্রসারী সংস্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ইসলামের সর্বপ্রধান সংক্ষার হলো রোযার ব্যাপারে ধারণাগত পরিবর্তন। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের দৃষ্টিতে রোযা ছিল বেদনা ও শোকের প্রতীক। ইসলাম এই হতাশাব্যঞ্জক ল্রান্ত ধারণাকে স্বীকার করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে রোযা হলো, এমন এক সার্বজনীন ইবাদত যা রোযাদারকে দান করে আত্মার সজীবতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তাধারার বিভন্নতা। এ রোযার মাধ্যমেই লাভ করে বান্দা এক অপার্থিব স্বাদ, লাভ করে এক নতুন উদ্যম ও প্রেরণা। রোযার উপর আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তা এক মুহূর্তে মানুষকে করে তোলে ডোগে বিতৃষ্ণ, ত্যাগে উদ্বন্ধ এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। হাদীসে কৃদ্সীতে উল্লেখ রয়েছে; আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ 'রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার দান করবো।' অন্য এক হাদীসে আছে, 'রোযাদার ব্যক্তি দৃটি আনল লাভ করবে। একটি আনল হলো ইফ্তারের মুহূর্তে আর অপরটি হলো তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে।'

রোযাদার ব্যক্তির যেন সাধ্যাতীত কোন কষ্ট না হয় এর জন্য রাস্লুল্লাহ্ (সা) সাহ্রীকে সুনাত এবং বিলম্বে সাহরী গ্রহণ করাকে মুম্ভাহাব বলেছেন। এমনিভাবে ইফ্তারের সময় বিলম্ব না করে ওয়াক্ত হতেই ইফ্তার করার হুকুম দিয়েছেন।

কোন কোন প্রাচীন ধর্ম মতে রোয়া এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য পালনীয় ছিল। কিন্তু ইসলাম রোযাকে সকল শ্রেণী বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত করে এক সার্বজনীন রূপ দান করেছে। ইসলামের বিধানে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য রোয়া রাখা ফর্য।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে (২ ঃ ১৮৫)।

প্রাচীন ধর্মসমূহে শ্রেণী বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিশেষ কোন কারণবশত কাউকে রোযা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু ইসলাম এ ক্ষেত্রে উনার নীতি গ্রহণ করেছে। মাযূর- অক্ষম ব্যক্তিদের রোযার বিষয়টি বিবেচনায় এনে ওযর দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

তোমাদের কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পুরা করতে হবে (২ ঃ ১৮৫)।

রোযার ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এত বাড়াবাড়ি ছিল যে, তারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতো। আবার কেউ কেউ কেউল গোশৃত জাতীয় খাদ্য বর্জনকেই রোযার জন্য যথেষ্ট মনে করতো। কিন্তু ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উদারতা উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছে। বস্তুত ইসলামী রোযা হলো ভারসাম্যপূর্ণ এক ঐশী বিধান।

এখানে যেমন অধিকার নেই আত্মাকে অমানবিক কষ্ট দেয়ার কিংবা নিজের জন্য জীবন্ত সমাধি রচনা করার। তেমনি অবকাশ নেই স্বেচ্ছাচারিতার। ইয়াহূদীরা শুধূ ইফ্তারের সময় খাদ্য গ্রহণ করত। এরপর খাদ্য পানীয় কোন কিছুই গ্রহণ করা তাদের ধর্মে বৈধ ছিল না। ফলে সারারাত তাদের পানাহারসহ যাবতীয় বৈধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হতো। কিন্তু আল-কুরআন মানুষের মনগড়া যাবতীয় নিয়ম-কানূন ও বিধি-নিষেধ খতম করে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার গুদ্ররেখা সুস্পষ্টরূপে তোমানের নিকট প্রতিভাত না হয় (২ ঃ ১৮৭)।

সকল প্রাচীন ধর্মেই সৌর মাস হিসাবে রোয়া রাথার বিধান ছিল। তাই দিন তারিথ এবং মাসে হিসাব রাথার জন্য সৌর বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়াও সৌর বর্ষের কারণে প্রতি বছর একই সময় নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখতে হতো। এতে কখনো কোনরূপ রদবদল হতো না। কিন্তু ইসলামে সৌর মাসের পরিবর্তে চান্দ্র মাসের হিসাবে রোয়া ফর্য করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে তা শেষ করবে (তিরমিযী)।

রোযাকে চান্দ্র মাসের সাথে সম্পর্কিত করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় সৃষ্কল এই যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন মানুষ অতি সহজেই রোযা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এমনকি গভীর অরণ্যে পর্বত চূড়ায় অথবা জনমানবহীন কোন দ্বীপে বসবাসকারী ব্যক্তিও চাঁদ দেখে রোযা রাখতে পারছে অনায়াসে। এর জন্য তাকে সৌর বিজ্ঞানের ছাত্র হতে হয় না। এর আরেকটি সুফল হলো, চান্দ্র মাসের কারণে ধীরেধীরে রমযানের মৌসুম পরিবর্তন হয়ে থাকে। কখনো রমযান আসে গরমে আবার কখনো বা শীতে। মৌসুমের এ পরিবর্তনের ফলে নতুনত্বের একটা স্থাদ পাওয়া যায়। এতে

শীত ও গরমের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ উভয় প্রকার রোযায় অভ্যন্ত হয়ে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ ও শৌক্র আদায়ের তাওফীক লাভ করছে মুসলমান। একজন মুসলমান যখন হিকমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণে ভরপুর এ রোযার সাথে প্রাচীন ধর্মসমূহের উপবাস ব্রতের তুলনা করে এবং রোযার সাথে মুসলিম উন্মাহ্র একনিষ্ঠ প্রেম ও গভীর ভালবাসার ইতিহাস পাঠ করে তখন তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতঃস্কৃতভাবে বেরিয়ে আসে এ অকপট সীকৃতি ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيُّ هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لُولًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ حَاءَتْ رُسُلُ رَ يَنَا بَالْحَقِّ -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণীই এনেছেন (৭ঃ ৪৩)।

রোযা ও রমযান মাস সম্পর্কীয় পরিভাষা

সাওম (مَنُوْمُ) ঃ অর্থ রোযা। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ এবং একবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই এ শব্দটি সমভাবে ব্যবহৃত হয়।

সিয়াম (عييًام) ঃ শব্দটি এর অর্থ রোযা রাখা।

সায়িম (ഫ്ഫ) ঃ সিয়াম পালনকারী বা রোযাদার।

সাওমে দাউদ (صَوْمٍ دَارَدُ) ঃ দাউদ (আ) -র অনুকরণে রোযা রাখা—একদিন রোযা রাখা এবং একদিন হুড়ে দেওয়া।

সাওমে বিসাল (مَنُوْمُ وَصَالُ) । দুই বা ততোধিক দিন করে একাধারে রোযা রাখা। এর মধ্যে কোন ইফ্তার না করা।

সাওমে আতরা (صَوْم عَاشُوْرَاء) ३ মুহাররামের দশ তারিখে রোযা রাখা। আইয়ামে বীযের রোযা (صَوْم أَيَّامُ النَّبِيْضُ) ३ প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা (কাওয়ায়িদুল ফিক্হ)।

সাহরী (سَحْرَى) ঃ অর্থাৎ রোযাদার ব্যক্তি অর্ধরাত্রের পর হতে স্বহে সাদেক পর্যন্ত সময়ে রোযার বিয়তে যে খানা খায় একে সাহরী বলে। উল্লেখ্য যে, আরবীতে একে اَلسُحُوْرُ वना হয়।

ইফ্তার (افْطَار) ঃ সূর্যান্তের পরপর রোযাদার ব্যক্তি যে খাদ্য গ্রহণ করে একে ইফ্তার বলে

তারাবীহ (تَرَاوِيْعُ) ៖ রমযান মাসে ইশার সুন্নাতের পর বিত্রের আগে বিশ রাক'আত নামায আঁদায় করা সুন্নাত। একে তারাবীহ নামায বলে। রোযা ১৫

শবে কদর (شب قدر) ঃ কাদ্রের রাত্র যা রমযানের শেষ দশকের কোন এক বি-জোড রাত হয়ে থাকে।

ই'তিকাফ (এইটি) ঃ জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় এমন কোন মসজিদে কোন পুরুষ ব্যক্তির এবং নিজ গৃহে নির্দিষ্ট স্থানে কোন মহিলার বিশেষ নিয়ত সহকারে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

মু 'তাকিফ (مُعْتَكَفُ) ३ ইতিকাফকারী ব্যক্তিকে মু 'তাকিফ বলে।

কাষা (فَضَاءُ) ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে কাষা অর্থ কোন ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ের পরে আনায় করা।

কাফ্ফারা (كَفَّارُةُ) ঃ কাজে ক্রটি হয়ে যাওয়ার পর সাদাকা বা রোযার ন্বারা তার ক্ষতিপুরণ করাকে শরীয়তে কাফ্ফারা বলা হয়।

সাদাকাতৃল ফিত্র (صَدَفَةُ الْفَطْرِ) ३ ঈদুল ফিত্রের দিন সকালে মালিকে নিসাব ব্যক্তির উপর যে সাদাকা ওয়াজিব হয় তাকে সাদাকাতৃল ফিত্র বলা হয়।

ঈদুল ফিত্র (عِيْدُ الْفِطْرِ) ঃ দীর্ঘ এক মাস রেয়া রাখার পর শাওয়ালের ১লা তারিখে যে ঈদ উদ্যাপন করা হয় তাকে ঈদুল ফিত্র বলা হয়।

রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষ মহিলা যাদের শরয়ী কোন ওযর নেই এরূপ সকলের উপরই রম্যান মাসের এক মাস রোযা রাখা ফর্য।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ياَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ـ

'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার (২ ঃ ১৮৩)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ شُهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصِيُّ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَةُ مَنْ لَيَّامِ الْخَرَ .

সূতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে আর কেউ পীড়িত থাকলে কিংবঃ সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পুরা করবে (২ % ১৮৫)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ صَلُواْ خَمْسِكُمْ وَصُومُواْ شَهْرَكُمْ وَحُجُواَ بَيْتَ رَبَكُمْ وَأَذُواْ زَكوَة اَمْوَالِكُمْ طيبة بِهَا اَنْفُسِكُمْ تَدْخُلُواْ جَنَّةَ رَبَكُمْ -

'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াজ নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করবে এবং স্বতঃস্কৃতভাবে নিজেনের মালের যাকাত আদায় করবে। তাহলেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে রোযার ফরিযায়াতের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা ঐকমত্য রয়েছে। সূতরাং কেউ যদি এর ফরিযায়াত অস্বীকার করে তবে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

কোন প্রাপ্তবয়ঙ্ক ব্যক্তি যদি বিনা ওযরে রোযা না রাখে তবে সে গুনাহগার হবে। সারা জীবন রোযা রাখলেও তার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسيُول الله صلى الله عليه وسلم قَال مِنْ اقطر يومًا مِنْ رمضًان مِنْ غير رخصة ولا مرض لَم يقضه صوم الدهر كله وإن صام -

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কেউ যদি শরয়ী কোন ওযর বা অসুস্থতা না থাকা সত্ত্বেও রমযানের কোন একটি রোযা না রাখে তবে জীবনভর রোযা রাখলেও এর বদলা হবে না (মিশকাত ঃ ১ম খণ্ড)।

রোযার মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাক্ওয়া, হৃদয়ের পবিত্রতা, শালীনতা, উনুত নৈতিকতা এবং আত্মার সজীবতা ও চিন্তাধারার বিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা। তাই ইসলামে রোযার যাহিরী বিধি-বিধানের গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতিও বিশেষ তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

রোযা যাতে অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয় এবং তা যেন একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। এ জন্যই রাস্লুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ الِيُمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَلَه مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ -

যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রম্যানের রোয়া পালন করে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী) রোয্ ১৭

বস্তুত যে রোযা আল্লাহ্র ভয়, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং চারিত্রিক মাহাত্ম্য শূন্য হয় সে রোযা যেন প্রকৃত অর্থে কোন রোযাই নয়

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قبال قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قبول الزور والعمل به فليس لله حباجة فى أن يعد طعامه وشرابه .

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাস্পুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি, তার এরূপ পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী) ।

হযরত আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি তার এরূপে পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী)।

হযরত আবৃ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রোযা হলো ঢালস্বরূপ। যদি না সে নিজেই তা ছিদ্র করে দেয়। সাহাবাগণ আর্য করলেন, কোন্ জিনিস দ্বারা রোযা ছিদ্র হয়ে যায় ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ মিথ্যা কথা ও গীবত দ্বারা (আওসাত)।

যে কাজের দারা রোযার তাৎপর্য বিনষ্ট হয় এরূপ কাজ থেকে পরহেয করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) জোর তাকীদ করেহেন।

তিনি বলেছেনঃ

وإذًا كَان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصبخب فان سابه احد او قاتله فليقل إنى امر عصائم ـ

রোযার অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার (বুখারী)।

রোযাকে প্রাণবন্ত করতে হলে যেমনিভাবে রসনার হিফাযত জরুরী অনুরূপ চোখ, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযতও জরুরী। রোযা কবৃল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো হালাল খাদ্য গ্রহণ। সাহ্রী ও ইফ্তারের সময় পরিমিত আহার করাও বাঞ্ছনীয়।

রোযার ফ্যীলত ও উপকারিতা

রোযার বহু ফ্যীলত রয়েছে। রয়েছে এর মধ্যে বহু উপকারিতা। নিম্নে এর দ্'-চারটি তুলে ধরা হলো: বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولايجهل وإن امرو قاتله أو شاتمه فليقا إنى صائم مرتين والذى نفسى بيده لخلوف فم الصبائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلى الصباح لى وأنا أجزى به -

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঐ সন্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ অবশ্যই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশ্কের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম উৎকৃষ্ট। সে আমার জন্য পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে। রোযা আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব (বুখারী)।

অপর এক হাদীসে আছে ঃ

عن سهل عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الجنة بابا يُقَال له الريان يدخل منه الصَّائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيرهم يُقَال أنت الصَّائمون فيقومون لايدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه .

হযরত সাহল (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যে রাইয়ান নামক একটি দরজা রয়েছে, কিয়ামতের দিন রোযাদার লোকরাই এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে রোযাদার লোকেরা কোথায় ? তখন তারা দাঁড়াবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে (বুখারী)।

রোযার মধ্যে বহু উপকারিতা নিহিত রয়েছে। যেমন ঃ

- ১. রোযার দ্বারা স্বভাবতই প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয়, চারিত্রিক পরিত্তির আসে। কেননা ক্লুধা ও পিপাসার কারণ্রে মানুষের জৈবিক ও পাশবিক বৃত্তি নিস্তেজ হয়। মনুষাত্ব জ্প্রত হয় এবং অন্তর বিগলিত হয় মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়।
- ২. রোযার দ্বার মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয়ভীতি এবং তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, لَــُـنَّـُمُ عَتَفُوْنَ যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।
- রোষার দ্বারা মানুষের স্বভাবে ন্মতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহ্র
 আয়মত ও মহত্ত্বের ধারণা জায়ত হয়।

রেয়া ১৯

- 8. রেয়ার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়।
- ৫. দুরদর্শিতা প্রথর হয়।
- রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে এক প্রকার রহানী শক্তি সৃষ্টি হয়।
- ৭. রোযার দ্বারা পণ্ড স্বভাব দূরীভূত হয়।
- রোয় মানুষের মধ্যে ফেরেশ্তা চরিত্র সৃষ্টি করে।
- রোযার মাধ্যমে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হয়।
- ১০. রোযার বরকতে মানুষের মধ্যে ভ্রাভূত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি কোন দিনও ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত থাকেনি সেক্ষানা ক্ষুধা-পিপাসার কন্ত বুঝতে পারে না।
- ১১. রোযা পালন আল্লাহ্র প্রতি গভীর প্রেমের অন্যতম নিদর্শন। কেননা কারো প্রতি ভালবাসা জিনালে তাঁকে লাভ করার জন্য প্রয়োজনে প্রেমিক পানাহার বর্জন করে এবং দুনিয়ার সব কিছুকে ভুলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে রোযাদার ব্যক্তিও আল্লাহ্ প্রেমে দেওয়ানা হয়ে স্ব কিছু ছেড়ে দেয় এমনকি পানাহার পর্যন্ত ভুলে যায়। তাই রোযা হলো আল্লাহ্ প্রেমের অন্যতম নিদর্শন।
- ় ১২. রোযা মানুষের জন্য রহানী খাদ্যতুল্য। এ খাদ্য পরকালে কাজে আসবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রোযা রখিবে না সে পরকালে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকবে (আহ্কামে ইসলাম)।
 - ১৩. রোযা মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ। তা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হিফাযত করে।
- ১৪. রোযার দ্বারা কলবের ইসলাহ্, আত্মার পরিতদ্ধি এবং হৃদয়ের সজীবতা হাসিল হয়। সর্বোপরি এর দ্বারা অন্তরাত্মায় হাসিল হয় প্রচুর প্রশান্তি এবং দূরীভূত হয় হৃদয়ের অস্থিরতা। পদ্দান্তরে পানাহারের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি ও অযথা গল্প-গুজব মানুষকে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে গোমরাহীতে লিও করে দেয়।
- ১৫. রোযার দারা শারীরিক সুস্থতা হাসিল হয়। কেননা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে প্রতিটি মানুষের জন্যই বছরে কয়েকদিন উপবাস থাকা আবশ্যক। তাদের মতে স্বল্প খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। সূফী-সাধকগণের মতে হৃদয়ের স্বাচ্ছতা হাসিলে স্বল্প খাদ্য গ্রহণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে (আরকানে আরবা)।

রোযার সময়

রোযার সময় হলে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত। কাজেই সুবহে সাদিক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস সবিকিছু করা জায়েয়। অনুরূপ সূর্যান্তের পরও উপরোক্ত কাজগুলো জায়েয়। শেষরাতে সাহ্রী খাওয়া এবং রোমার নিয়ত করে নেয়ার পর রাত থাকা সত্ত্বেও কিছু থাওয়া-দাওয়া বা স্ত্রী সহবাস করা না জায়েয় নয়। তবে সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে এ কাজগুলো করা উচিত নয়। অবশ্য এ অবস্থায় পানাহার করলে রোযা শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সুবহে সাদিকের পরে সাহ্রী খাওয়া হয়েছে তবে সেই রোযার কাষা করতে হবে। সূর্যান্ত হয়ে গেছে মনে করে ইফ্তার করার পর যদি দেখা যায় যে, মূলত সূর্যান্ত হয়নি এ অবস্থায় বাকি সময়টুকু রোযা অবস্থায় কাটাতে হবে এবং ঐ রোযার কাষা করতে হবে (হেদায়া, ১ম খণ্ড)।

সূর্যন্তি হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে ইফ্তার করা জায়েয নয়। যদি সন্দেহ নিয়ে ইফ্তার করা হয় আর সূর্যন্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যায় তবে ঐ রোযা কাষা করতে হবে। যদি সন্দেহ নিয়া ইফ্তার করার পর সূর্যান্ত হয়নি বলে নিশ্চিত হওয়া যায় তবে কাষা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম ২৩)।

ভৌগোলিক ও মৌসুমণত কারণে দিন ছোট-বড় হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এবং মৌসুমের বিভিন্নতার দরুন পৃথিবীর সকল স্থানে দিন-রাত এক সমান হয় না। কোথাও কোথাও দিন ১৩ ঘণ্টা হতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্তও দীর্ঘ হয়ে থাকে। আবার মেরু এলাকায় মাসের পর মাস একটানা দিন ও একটানা রাত চলতে থাকে। ঐ সকল এলাকায় রোযা আদায়ের জন্য ফকীহ্গণ নিম্নরূপ সমাধান দিয়েছেন ঃ

- ১. যে সকল এলাকায় প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দিবাভাগ দীর্ঘ হয় ঐ সকল এলাকায় পূর্ণ দিবাভাগ রোযা রেখে সূর্যান্তের পরে ইফ্তার করতে হবে।
- ২. যে সকল এলাকায় ২৪ ঘণ্টার বেশি বা একটানা দিন-রাত হয়ে থাকে ঐ সকল এলাকার বাসিন্দারা তাদের নিকটতম যেই অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দিন-রাত হয়ে থাকে ঐ অঞ্চলের সময়কে স্টান্ডার্ড সময় ধরে তদনুযায়ী রোযা আদায় করবে।
- ৩. যদি কেউ এত দীর্ঘ সময় ব্যাপী রোযা রাখতে অসমর্থ হয় তবে সে ঐ সময় রোযা ছেড়ে দিয়ে সুবিধাজনক মৌসুমে ঐ রোযা কাযা করে নিবে।
- ৪. যদি সুবিধাজনক সময় ঐ এলাকায় কখনো না আসে এবং রোয়া রাখার মত সক্ষমতাও অর্জন করতে না পারে তবে চিররুয়্ল অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় রোয়ার ফিদ্য়া আদায় করে নিবে।
- ৫. কোন মুসাফির ব্যক্তি ঐ সকল এলাকায় সফর অবস্থায় রোয়া রাখলে তাকে ঐ অঞ্চলের মুকীমদের অনুরূপ রোয়া পালন করতে হবে। অবশ্য মুসাফিরদের জন্য সফর অবস্থায় রোয়া কায়া করার ইখৃতিয়ার রয়েছে। অর্থাৎ ঐ সময় রোয়া না রেখে অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে তা আদায় করে নিতে পারবে (শামী, ২য় খণ্ড অবলয়নে);

রোযা ২১

বিমানে ভ্রমণকালে দিন ছোট-বড় হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান

বিমানযোগে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে ভ্রমণকালে দিন ক্রমাগতভাবে দীর্ঘ হতে থাকে। এমনকি পশ্চিম দিকে অবিরাম বিমান চলতে থাকলে ২৪ ঘণ্টার চেয়েও দিবা ভাগ দীর্ঘ হতে পারে। আবার পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে যাওয়ার সময় দিন ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। এমতাবস্থায় ফকীহ্গণের মতে রোযা আদায়ের হকুম নিমরূপ ঃ

- ১. রোযাদার ব্যক্তি সুবহে সাদিক হতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি স্থান্তি হয় তবে স্থান্তির পরে ইফ্তার করবে। আর যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্থান্তি না হয় তবে সাধারণত ইফ্তার ও পানাহার করতে যতটুকু সময় লাগে ২৪ ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার ততটুকু সময় আগে ইফ্তার ও পানাহার করে নিবে।
- পূর্ব দিকে সফরকারী ব্যক্তি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে সূর্যান্ত
 পাবে এবং সূর্যান্তের পর ইফ্তার করবে।
- যদি বিমান খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়, তাতে সফরকারী ব্যক্তি ইফ্তারের ব্যাপারে স্বাভাবিক অবস্থায় যতটুকু সময় রোয়া রাখত ততটুকু সময় রোয়া রেখে তারপর ইফ্তার করবে।

রোযা ফর্য হওয়ার শর্ত

রোযা ফর্য হওয়ার শর্ত তিনটিঃ

- ১. মুসলমান হওয়া।
- ২. জ্ঞানবান হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া।
- ৩. বালিগ হওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানবান, বালিগ মুসলমান যাদের শর্য়ী কোন ওযর নেই এমন প্রত্যেক নর-নারীর উপর রোযা রাখা ফরয।

রোষা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

রোযা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত দুটিঃ

- ১. সুস্থ থাকা।
- ২. মুকীম হওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্ত

রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্ত দুটি ঃ

- ১, নিয়ত করা।
- ২. মহিলাদের হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযার নিয়ত সম্পর্কিত মাসাইল

রোযা সহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত। নিয়ত হলো, অন্তর দিয়ে কোন কাজের সংকল্প করা। রোযার ক্ষেত্রে এরূপ সংকল্প করা যে 'আমি রোযা রাখছি'। মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। প্রত্যেক দিনের রোযার জন্য নিয়ত করা আবশ্যক।

শারথ নাজমূদ্দীন নসফী (র)-এর মতে রমযানে সাহ্রী খাওয়ার দারা নিয়ত আদার হয়ে যায়। অন্য রোযার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আরবীতে নিয়ত করা জরুরী নয়। তবে কেউ যদি আরবী শব্দে নিয়ত করতে চায় তাহলে বলবে : نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمٌ غَدًا مَنْ شَهُر رَمَضَان আমি রম্যান মাসের আগামী দিনের রোযা রাখার নিয়ত করছি।

কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ চাহে তো আগামীকাল রোযা রাখব। কবুও তার নিয়ত সহীহ্ হবে। চাল্র মাসের ক্ষেত্রে রাত আগে আসে এবং দিন পরে আসে। রোযার নিয়ত করার সময় সূর্যন্তির পর থেকে আরম্ভ হয় এবং তা 'যুহওয়াতুল কুব্রা'র পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। 'যুহওয়াতুল কুব্রা' বলা হয় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যন্তি পর্যন্ত মোট সময়ের মধ্যবর্তী সময়কে। সূতরাং সূর্যন্তির পূর্বে রোযার নিয়ত করা জায়েয় নয়। সূর্যান্তের পূর্বে নিয়ত করা জায়েয় 'যুহওয়াতুল কুব্রা'র পূর্বে নিয়ত করা তখনই জায়েয় হবে যদি সুবহে সাদিকের পর থেকে এর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করে থাকে তবে সুবহে সাদিকের পরবর্তী নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি রম্যান মাসে নির্দিষ্টভাবে রম্যানের রোযা বা ফর্য রোযার নিয়ত না করে শুধু এতটুকু বলে যে আমি আজ্ব রোযা রাখব অথবা রাতে মনে মনে বলে যে, আগামীকাল আমি রোযা রাখব তবে এতেও রম্যানের রোযা সহীহ হয়ে যাবে।

যদি কেউ রমযান মাসে রমযানের রোযা না রেখে নফল রোযার নিয়ত করে এবং একথা মনে করে যে, রমযানের রোযা পরে কাযা করে নিব তবে এ অবস্থায়ও রমযানের ফরয রোযা আদায় হয়ে যাবে। নফল রোযার নিয়ত সহীহ্ হবে না। এক রমযানে কেউ যদি অপর রমযানের কাযা রোযার নিয়ত করে তবুও রমযানের ফরয রোযাই আদায় হবে। কাযার নিয়ত সহীহ্ হবে না। রমযানের পর কাযা আদায় করবে। কেউ যদি রম্যানের রোযার নিয়ত না করে মানতের ওয়াজিব রোযা আদায় করার নিয়ত করে তবুও রমযানের রোযাই আদায় হবে। মানতের রোযা আদায় হবে না। পরবর্তী সময় মানতের রোযা আদায় করতে হবে। মানতের রোযা আদায় বে কোন রোযারই নিয়ত করুক তাতে রমযানের রোযাই আদায় হয়ে যাবে। অন্য কোন রোযার নিয়ত সহীহ্ হবে না।

মুসাফির এবং রুগ্ন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্টভাবে রমযানের রোযার নিয়ত না করে শুধু এতটুকু বলে যে, আমি আজ রোযা রাধব তবে এতেও রমযানের রোযা আদায় হবে। দিনের বেলা রোযার নিয়ত করলে এভাবে নিয়ত করবে যে, 'যখন হতে দিন শুরু হয়েছে তখন থেকে আমি রোমা রাখার নিয়ত করেছি' যদি এরূপ বলে যে, 'এখন থেকে আমি রোযা রাখার নিয়ত করলাম' তবে এ নিয়ত সহীহ্ হবে না এবং উক্ত ব্যক্তি রোযাদার হিসাবে গণা হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ যনি রমযান মাসে রাত বা দিনে বেহঁশ হয়ে যায় আর দ্বিপ্রহরের পূর্বে তার হঁশ ফিরে আনে এবং এর মধ্যে যদি রোযা ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে ও এ অবস্থায় যদি রোযার নিয়ত করে নেয় তবে তার রোযা সহীহ্ হবে। পাগলের বেলায়ও স্কুম অনুরূপ। দিনের প্রথম ভাগে কোন মুসলমান মুরতাদ হয়ে যদি পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে রোযার নিয়ত করে তবে তার রোযা সহীহ্ হবে। নিয়তের ক্ষেত্রে উত্তম হলো রাভে নিয়ত করা এবং নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা। কাযা ও কাফ্ফারার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে রোযার নিয়ত রাতেই করতে হবে। কোন মহিলা যদি হায়িযের অবস্থায় রোযার নিয়ত করে এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে সে পবিত্র হয়ে যায় তবে তার রোযা সহীহ্ হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযার ফরয

রোযার ফর্য দু'টি ঃ

- ১. নিয়ত করা,
- ২. পানাহার, স্ত্রী সহবাস এবং এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ্ তা আলা রামযানের রাতে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাসকে বৈধ করেছেন। কিন্তু রোযা অবস্থায় একাজ বৈধ নয় (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

রোযার সুরাত ও আদাব

রোয' রাখার উদ্দেশ্যে সাহ্রী খাওয়া সুন্নাত। যথাসম্ভব দেরি করে সাহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব হবে। এত বেশি দেরি করবে না যে সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় এবং রোযার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। সূর্যন্তি হওয়ার পর বিলম্ব না করে শীঘ্র শীঘ্র ইফ্তার করা সুন্নাত (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

ইফ্তারের সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত ঃ

اللهُمُّ لَكَ صُمُتُ وَبِكَ امَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَعَلى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ _ মাগরিবের নামাযের আগে ইফ্ভার করা মুস্তাহাব (আলমগীরী)।

রোযার প্রকারভেদ

রেয়ে সাধারণত তিন প্রকারঃ

১. ফর্য রোযা, ২. ওয়াজিব রোযা ও ৩. নফল রোযা।

ফর্ব রোযা

ফর্য রোযা দুই প্রকার ঃ

- निर्मिष्ट फत्रय, त्यमन त्रमयात्नत द्वाया ।
- ২. অনির্দিষ্ট ফরয, রমযানের কাষা রোযা এবং সকল প্রকার কাফ্ফারার রোযা

যে সকল নিষিদ্ধ কাজের দও হিসাবে শরীয়তে রোযা রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে তাকে কাফ্ফারার রোযা বলে। যেমন কসম করে তা ভংগ করা, রমযানের রোযা রেখে বিনা ওযরে তা ভঙ্গ করা।

যে কোন কারণে রমযানে রোযা না রেখে পরবর্তী সময়ে ঐ রোযা রাখাকে কাযা রোযা বলে।

ওয়াজিব রোযা

যে কোন মানতের রোযা ওয়াজিব রোযা হিসেবে গণ্য। এটা দু'প্রকার ঃ

- ১. নির্দিষ্ট দিনের মানতের রোযা
- ২. অনির্দিষ্ট দিনের মানতের রোযা।

মানত রোযা

কেউ যদি রোযা রাখার মানত করে তবে তার জন্য ঐ রোযা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি ঐ রোযা না রাখে তবে হুনাহগার হবে। কেউ যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে মানত করে এবং বলে, হে আল্লাহ্! আমার অমুক কাজটি যদি আজ সম্পন্ন হয়ে যায় তবে আগামীকাল আপনার উদ্দেশ্যে একটি রোযা রাখব অথবা এরূপ বলল যে, যদি আমার অমুক কাজটি হয়ে যায় তবে পরত গুক্রবার দিন আমি একটি রোযা রাখব। ঐকাজ পূর্ণ হলে তার জন্যে ঐ নির্দিষ্ট দিনের রোযা রখা ওয়াজিব হবে।

জুমু আর দিন আসার পর রোযা রাখার সময় মানতের নিয়ত না করে সে যদি শুধু রোযা রাখার নিয়ত করে অথবা নফল রোযার নিয়ত করে তবে এতেও মানতের রোযা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ঐ তারিখে কায় রোযার নিয়ত করে এবং মানতের কথা মনে না থাকে অথবা মনে ছিল কিন্তু ইচ্ছা করেই কাযার নিয়ত করেছে তবে কাযা রোযাই আদায় হবে। মানত আনায় হবে না। মানতের রোযা পরে কাযা করতে হবে।

কেউ যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট না করে মানত করে এবং এরূপ বলে যে, আমার অমুক কাজটি যদি হয়ে যায় তবে আল্লাহ্র ওয়ান্তে আমি একটি রোযা রাখব অথবা শর্তহীনভাবে তথু একথা বলল যে, আমি আল্লাহ্র ওয়ান্তে পাঁচটি রোযা রাখব তবে এরূপ মানত করাও দুরস্ত আছে। এভাবে মানত করলে রাতেই রোযার নিয়ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের পর মানতের রোযার নিয়ত করলে অনির্দিষ্ট মানতের রোযা আদায় হবে না। বরং এ রোযা নফল হয়ে রাবে (মারাকিল ফালাহ্)।

রোযা ২৫

যদি কেউ অর্ধনিন রোযা রাখার মানত করে তবে মানত সহীহ্ হবে না। যদি কেউ অনির্দিষ্টভাবে একদিন রোযা রাখার মানত করে তবে একদিনের রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য আদায়ের তারিখ নির্ণয় করা তার ইখ্তিয়ারাধীন থাকবে। যে দিন ইচ্ছা সেদিনই তা রাখতে পারবে। যদি কেউ দুই দিন বা তিন দিন অথবা দশ দিন রোযা রাখার মানত করে তবে এ রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য আদায় করার ব্যাপারে সে স্বাধীন, ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথকভাবে রাখতে পারবে অথবা একত্রেও রাখতে পারবে। যদি একাধারে রাখার মানত করে তবে একাধারেই রাখতে হবে। পৃথক পৃথকভাবে অথবা মাঝখানে দু'-একদিন বাদ দিয়ে রোযা রাখে তাহলে তা আনায় হবে না। এ ক্ষেত্রে যদি কোন মহিলার হায়িয বা নিফাস আরম্ভ হয়ে যায় তবে তাকে পুনরায় প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে।

কেউ যদি পৃথকভাবে কয়েকদিন রোযা রাখার মানত করে অভঃপর তা একত্রে আদায় করে নেয় তবে মানত আদায় হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে, আমি কয়েকদিন রোযা রাখার মানত করলাম তবে কমপক্ষে তিনদিন রোযা রাখতে হবে। আর বহুদিন রোযা রাখার মানত করলে ইমাম আবৃ হানীফা (র)-এর মতে দশদিন এবং সাহিবাইনের মতে সাতদিন রোযা রাখতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ এরপ মানত করে যে আমি বৃহস্পতিবার রোযা রাখব; তাহলে তাকে পরবর্তী বৃহস্পতিবারই সে রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের রোযার মানত করে তবে প্রতি বৃহস্পতিবারই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। বৃহস্পতিবারে ঐ রোযা না রাখলে সে রোযার কাযা ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ ঈদের দিন রোয়া রাখার মানত করে তবে রোয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু এ দিনে রোয়া রাখা নিষ্কি বিধায় পরবর্তীতে এর কায়া করে নিতে হবে। কেউ যদি এরপ মানত করে যে, আমি সারা বছর রোয়া রাখব তবে দুই ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন রোয়া রাখবে না। পরবর্তী সময় এ পাঁচ দিনের কায়া আদায় করে নিবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ঈদুল ফিত্রের আগে এরপ মানত করে থাকলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি শাওয়াল মাসে এভাবে মানত করে তবে ঈদুল ফিত্রের কাযা ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে আইয়ামে তাশরীকের পরে করলে দুই ঈদ এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনসমূহের কাযা আবশ্যক হবে না।

আর কেউ যদি পূর্ণ এক বছর রোযা রাখার মানত করে তবে তাকে পূর্ণ এক বছরই রোযা রাখতে হবে এবং রমযানের ত্রিশ ও দুই ঈদ এবং আইয়ামে তাশরীকের পাঁচদিন মোট পঁয়ত্রিশ দিনের রোযার কাষা করতে হবে। যদি কোন মহিলা নির্দিষ্ট কোন বছরের রোযার মানত করে তবে হায়িয়ের দিনগুলো ছাড়া বাকি দিনগুলোর রোযা রাখবে। পরে এ দিন গুলোর কাষা আদায় করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

একদিনের রোযার মানত করতে গিয়ে যদি কারো মুখ দিয়ে এক মাসের কথা বের হয়ে যায়; তবে এক মাস রোযা রাখাই তার উপর ওয়াজিব হবে। কেনন মানতের মধ্যে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা উভয়ই সমান। কেউ যদি অনির্দিষ্টভাবে বলে, আমি এক মাসের রোযা রাখব তবে ত্রিশ দিন রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। যে মাস সে চায় নির্দিষ্ট করতে পারবে। মানতের পর পরই তা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তাই বিলম্বে আদায় করলেও গুনাহ হবে না।

একাধারে এক মাস রোয়া রাখার মানত করলে তাকে একাধারেই এক মাস রোয়া রাখতে হবে। আর যদি একাধারের মানত না করে তবে পৃথক পৃথকভাবে রাখাও জায়েয় হবে। কোন মাসকে নির্দিষ্ট করতঃ রোয়া রাখার মানত করে ঐ রোয়া রাখার সময় যদি এক বা একাধিক দিনের রোয়া না রাখে তবে ঐ দিনসমূহের রোয়া কায়া করতে হবে। আর যদি সেই মাসে মোটেই রোয়া না রাখে তবে এ রোয়ার কায়া আদায় করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। একাধারে তা রাখতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে পৃথকভাবেও রাখতে পারবে (অলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মানতের রোযা হথাসময় না রাখার ফলে তা যদি কায়া হয়ে যায় এবং কায়া আদারে বিলম্ব করতে করতে কেউ যদি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে যায় অথবা কেউ যদি সর্বদা রোযা রাখার মানত করে বার্ধক্যের কারণে কিংবা কটসাধ্য পত্থায় জীবিকা উপার্জনে লিগু হওয়ার কারণে কায়া আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ে তবে সে রোযা রাখবে না। বরং এক এক দিনের রোযার পরিবর্তে এক একজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াবে। যদি দারিদ্রের কারণে মিস্কীন খাওয়াতে সক্ষম না হয় তবে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যদি প্রচণ্ড গরমের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে সে সময় রোযা না রেখে শীতের মৌসুমে এর কায়া আদায় করবে (আল্মগীরী, ১ম খণ্ড)।

শর্ত সাপেক্ষে রোযার মানত করতঃ শর্ত পাওয়ার আগে রোযা রাখলে ঐ রোযা যথেষ্ট হবে না। শর্ত পূরণের পরে তা পুনঃ আদায় করতে হবে। নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখার মানত করে ঐ মাস আসার আগেই যদি রোযা রাখা হয়। তবে ইমাম আবৃ হানীফা এবং ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র)-এর মতে এ রোযা যথেষ্ট হবে। কিন্তু ইমাম মুহামদ (র)-এর মতে যথেষ্ট হবে না। কেউ যদি বলে, আমার রোগ ভাল হলে আমি আল্লাহ্র ওয়ান্তে এত দিন রোযা রাখব। সে ক্ষেত্রে রোগ মুক্তির পর ততদিন রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে।

একমান রোযা রাখার মানত করে মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই কেউ যদি মারা যায় তবে এ বিষয়ে ওসীয়ত করে যাওয়া আবশ্যক। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ প্রতিটি রোযার পরিবর্তে এক সা' (সাড়ে তিন সের অথবা ৩ কেজি ৪০০ গ্রাম) গম মিসকীনদের প্রদান করবে।

রোযা ২৭

অনুস্থ ব্যক্তি যদি বলে, আমি আল্লাহ্র ওয়ান্তে এক মাস রোষা রাখব। এরপর সুস্থ হওয়ার আগে যদি সে মারা যায় তবে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি এক দিনের জন্যও সুস্থ হয়ে থাকে তবে এক মাস রোষার ফিদ্য়া আদায়ের ওসীয়ত করে যাওয়া তার জন্য আবশ্যক। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যে ক'দিন সুস্থ থাকবে এ ক'দিনের ওসীয়ত করে যাওয়া তার জন্য আবশ্যক হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

নফল রোযা

ফর্যিয়াতের উপর আমল করার সাথে সাথে নফল আমলের অভ্যাস গড়ে তোলা ত্রতি জরুরী। রাসূলুরাই (সা) নফল নামায এবং নফল রোযার প্রতি বেশ উৎসাহিত করেছেন। এতে বহু ফর্যীলত রয়েছে। ফর্য আদায়ের মধ্যে কোন ক্রুটি থাকলে নফলের রারা তা পূরা করে দেয়া হবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সূতরাং ফর্য রোযার পাশাপাশি নফল রোযার প্রতি যতুবান হওয়াও বাঞ্জ্নীয়। অবশ্য বছরে পাঁচ দিন রোযা রাখা জায়েয় নয়। দুই সদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পর ১১,১২ এবং ১৩ই যিলহজ্জ মোট এই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। এই পাঁচদিন এবং রম্যানের রোযা ছাড়া যে কোন দিন নফল রোযা রাখা জায়েয়।

নফল রোযা যত বেশি রাখা যাবে তত বেশি সাওয়াব হবে। 'নফল রোযার কথা' উল্লেখ করে অথবা শুধু রোযার কথা উল্লেখ করে নিয়ত করলেও নফল রোযা সহীহ্ হবে। 'যাহওয়াতুল কুব্রা'র পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়ত করা দুরন্ত আছে। সূতরাং এর পূর্ব পর্যন্ত যদি পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস না করে থাকে এবং এ সময় রোযা রাখার নিয়ত করে তবে এ নিয়ত সহীহ্ হবে। নফল রোযা আরম্ভ করলে নফল রোযা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব কেউ যদি নফলের নিয়তে রোযা আরম্ভ করে তা তেঙে ফেলে তবে তার কাযা করতে হবে (কুদ্রী)।

স্বামী বাড়ি থাকা অবস্থায় স্ত্রীর জন্য তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা দুরস্ত নয়। এমনকি স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখার পর সে যদি তা ভেঙে ফেলার হুকুম করে তবে নফল রোযা ভেঙে ফেলা দুরস্ত আছে। পরে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে এর কাযা করতে হবে।

মেহমান যদি রোযাদার মেযবানকে নফল রোযা ভঙ্গ করে তার সাথে খানায় শরীক হওয়ার জন্য বলে তবে মেযবানের জন্য রোযা ভঙ্গ করে মেহমানের সাথে খানায় শরীক হওয়া জায়েয আছে। অবশ্য পরে এর কায়া করতে হবে (কাহী খান)।

আতরার রোযা

'আগুরা' শব্দটি আরবী। মহররম মাসের দশম দিবসকে 'আগুরা' বলা হয়। এদিনে রোযা রাখা প্রথমে ফর্ম ছিল, পরে রম্যানুল মুবারকের রোষা ফর্ম হওয়ার পর তা রহিত হয়ে যায়। আগুরার রোষা প্রবর্তিত হওয়া সম্বন্ধে ইমাম বুখারী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে একটি হাদীস করেছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, ইয়াহূদীরা আন্তরার নিন সাওম পালন করছে। তিনি জিব্রুস করলেন কী ব্যাপার ? তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন ? তারা বলল, এটি একটি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাসলকে তাদের শক্রর কবল থেকে নাজাত নান করেছেন। ফলে এ দিনে মূসা (আ) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন (বুখারী)।

অপর এক হাদীসে আছে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুক্লাহ্ (সা) প্রথমে আগুরার দিনে সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে যখন রময়নের রোয়া ফরয় করা হলো তখন তিনি বলেছেন, যার ইচ্ছা সে এ রোয়া রাখ আর যার ইচ্ছা সে এ রোয়া ছেড়ে দিবে (বুখারী)।

ফকীহ্গণ বলেন, আগুরার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। এতে বহু ফযীলত রয়েছে। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আগুরার রোযা দ্বারা আমি আশা করি যে বিগত এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু আগুরার দিনের রোযা রাখা মাকরহ। সুন্নাত তরিকা হলো আগুরার দিনের রোযার সাথে তার আগের দিন বা পরের দিনে মিলিয়ে দু'টি রোযা রাখা (আলমগীরী ও মারাকিল ফালাহ্)।

শা'বানের রোযা

শাবান মাস অত্যন্ত বরকত ও ফ্যীলতের মাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজবের চাঁদ্র উঠতেই আল্লাহ্র দরবারে এ মর্মে দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ্। আপনি রজব ও শাবান মাসকে আমাদের জন্য বরকত দ্বারা ভরপুর করে দিন এবং আমাদেরকে রম্যান পর্যন্ত পৌছিয়ে দিন। প্রকৃতপক্ষে শাবান হলো রম্যানের প্রস্তুতির মাস। এ কারপেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) রম্যান ছাড়া বাকি এগার মাসের তুলনায় এ মাসে বেশি সাওম পালন করেছেন। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) শাবান মাসের সেয়ে অধিক নফল রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। তিনি (প্রায়) পুরা শাবান মাসই সাওম পালন করতেন।

এ মাসের রোযা সুমূহের মধ্যে ১৫ই শা'বানের রে'যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইব্ন মাজা শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছেঃ

عن على رضى الله عنه قنال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدُنيا فيقول الامن مستغفر فاعافيه الاكذا الا كذا حتى بطلع الفجر .

রেযা ২৯

হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ্ (সা) বলেন ঃ শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে তোমরা ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে। কেননা সূর্যান্তের পর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে এ মর্মে আহ্বান করতে থাকেন যে, (তোমানের মধ্যে) কেউ ক্ষমপ্রাহী আছে কি ? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন রিয়কপ্রার্থী আছে কি ? আমি তার রিয়কের ব্যবস্থা করে দিব এবং কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আছে কি ? আমি তাকে বিপদগ্রস্ত করে দিব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি আহ্বান করতে থাকেন।

অপর এক হানীসে আছে, এ রাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বনু কালাব গোত্রের বকরী পালের শরীরে যে পরিমাণ পশম আছে এ পরিমাণ মানুষের পাপ ক্ষমা করে থাকেন (মিশ্কাত)।

এক হাদীসে এ কথাও উল্লেখ আছে, এ রাতে রাস্লুল্লাহ্ (সা) জান্নাত্ল বাকীর কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছেন। উপরোক্ত হাদীস সমূহের আলোকে আল্লামা শামী, আল্লামা ইব্ন নুজাইম, মাওলানা আবদূল হাই লক্ষ্ণৌবী (র) প্রমুখ ফকীহ্ এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগী করাকে মুস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুফ্তী শফী (র)-এর মতে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতের আমল হলো ঃ

- রাতে না ঘূমিয়ে সজাগ থাকা এবং ইবাদত, তিলাওয়াত ও যিক্র আয়কারে
 মশগুল থাকা।
- তাওবা ইস্তিগফার করত উভয় জাহানের কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্র দরবারে
 মুনাজাত করা :
- ৩. কবর যিয়ারত করা (হাদীস)
- 8. দিনে রোযা রাখা (শবে-বরাত কী হকীকত)

শবে বরাতের এ পুণ্যময় রজনী পাওয়ার পরও যারা এর কদর করে না, তাদের চেয়ে হতভাগা আর কে? এ রাতে বাড়িঘর এবং মসজিদের আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজি এবং থেল-তামাশার উদ্দেশ্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাফিরা না জায়েয কাজ। মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে মসজিদে হৈ-হল্লোড় করা নিলনীয় কাজ। এতে ইবানতে বিঘু সৃষ্টি হয় এবং ইবাদতের পরিবেশ নষ্ট হয়। এহেন বদ রুসুম থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

আরাফা দিনের রোযা

যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখকে 'ইয়াওমুল আরাফা' বা আরাফার দিন বলা হয়। এদিনে রোযা রাথা বড়ই সাওয়াবের কাজ। যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাথবে তার বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছর এই দুই বছরের সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রোযার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে হাজীদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হাদীস ফরীফে আছে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হতে ৯ যিলহজ্জ পর্যন্ত রোষা রাখা উত্তম। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের রাতগুলো বছরের অন্যান্য রাতের তুলনায় উত্তম (মারাকিল ফালাহ্)।

আইয়ামে বীষের রোযা

চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ এ-ই তিন দিনকে 'আইয়ামে বীয' বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে এই তিনদিন রোযা রাখল সে যেন সারা বছর রোযা রাখল। নবী করীম (সা) সাধারণত প্রতি মাসের এই তিনদিন রোযা রাখতেন। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা) বলেন, আমার বন্ধু রাস্লুল্লাহ্ (সা) আমাকে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

- ১. প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা
- ২. দু' রাক'আত সালাতুদ্ দুহা আদায় করা এবং
- ৩. নিদ্রার পূর্বে বিত্রের নামায আদায় করা।

অপর এক হাদীসে আছে, রাবী বলেন, রাস্লুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখতে হুকুম করতেন। এভাবে রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুলা (মারাকিল ফালাহ)।

সাওমে দাউদী

হযরত দাউদ (আ) একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। তাই এভাবে রোযা রাখাকে সাওমে দাউদী বলা হয়। কেউ অধিক পরিমাণে রোযা রাখার আগ্রহী হলে এ ভাবে রোযা রাখা উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট তা খুবই পছন্দনীয়। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে রাস্পুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দাউদ (আ)-এর রোযা আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দনীয় রোযা এবং তাঁর নামায আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয়। তিনি প্রথমে অর্ধরাত্র পর্যন্ত ঘুমাতেন এরপর জাগ্রত হয়ে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সময় ইবাদত-বন্দেগী কুরতেন। অবশেষে এক-ষ্ঠাংশ পরিমাণ সময় আবার ঘুমাতেন এবং তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন হেড়ে দিতেন (মারাকিল ফালাহ্)।

সাওমে বিসাল

রাতে পানাহার ইত্যাদি ব্যতিরেকে লাগাতার দুই বা ততোধিক দিন রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলে (মা'আরিফুস্ সুনান)।

তবে এভাবে রোযা রাখা মাকরহ (মারাকিল ফালাহ)।

রোযা ৩১

উপরে যে সব নফল রোযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এ ছাড়াও কিছু নফল রোযার বিবরণ হাদীস ও ফিকহ্-এর কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলোঃ

রমযানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাসীসে আছে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা সে যেন সারা বছরই রোযা রাখাল। একাধারে বা পৃথক পৃথকভাবে এই রোযা রাখা জায়েয় আছে। অবশ্য পৃথক পৃথকভাবে রাখা উত্তম। এই রোযা সপ্তাহে দু'টি করে রাখা ভাল (মারাকিল ফালাহ্ ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীসে আছে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার মানুষের আমল আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। অতএব আমি পছন্দ করি যেন রোযা অবস্থায় আমার আমল আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয় (মারাকিল ফালাহ্)।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে জুম্'আর দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

প্রতি সপ্তাহে বুধবার রোযা রাখা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দিনে রোযা রাখার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে হুকুম করেছেন (তিরমিয়ী ঃ ১ম খণ্ড)।

এ ছাড়াও যে কোন দিন নফল রোযা রাখা যায়। যত বেশি রাখবে তত বেশি সাওয়াব পারে।

রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিনসমূহ

দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পর তিননিন মোট পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এ দিনগুলোতে রোযা রাখবে না। কেননা এ হলো পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগের দিন। কেউ যদি এ দিনগুলোতে রোযা রাখতে আরম্ভ করে ছেড়ে দেয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মাক্রহ রোযা

তথু আগুরার একদিন রোযা রাখা মাকরহ। রাতে পানাহার ইত্যাদি ব্যতিরেকে সাওমে বিসাল করা মাকরহ। রোযা রেখে চুপ থাকার ব্রত পালন করা মাকরহ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলাদের জন্য নফল রোযা রাখা মাকরহ। কিছু স্বামী অসুস্থ, রোযাদার বা মুহ্রিম হলে তার অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা মাকরহ নয়। রোযা রাখার কারণে যদি মুসাফির ব্যক্তির কট হয় তবে রোযা রাখা মাক্রহ। যদি সফর সঙ্গী এবং কাফেলার অধিকাংশ লোক রোযা এবং তাদের সফরের খরচ যৌথভাবে নির্বাহ করা হয়, সেক্ষেত্রে সফরকারী ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা উত্তম। আরাফার দিন হাজীদের দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে রোযা রাখা মাকরহ। অনুরূপ, যিলহজ্জের আট তারিখে হাজীদের জন্য রোযা রাখা মাক্রহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

দিতীয় পরিচ্ছেদ

রোযা ভঙ্গের কারণ এবং কাযা ও কাফ্ফারা

বিভিন্ন কারণে রোফা ভঙ্গ হয়ে যায়। যে সব কারণে রোফা ভঙ্গ হয় রোফা অবস্থায় সেসব কাজগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য, অন্যথায় রোফা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রোফা ভঙ্গের পর কোন কোন অবস্থায় গুধু কাফা ওয়াজিব হয়। আবার কোন কোন অবস্থায় কাফা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং ওধু কাযা ওয়াজিব হয়

রোযাদার ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কোন কিছু আহার করানো হলে, কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়ার সময় রোযার কথা শ্বরণ থাকা দত্ত্বেও অসতর্কতাবশত পেটে পানি প্রবেশ করলে, রোযাদারের প্রতি কোন কিছু নিচ্ছেপ করার পর তা তার গলায় প্রবেশ করলে, জুব দিয়ে গোসল করার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়ে পানি গলার মধ্যে প্রবেশ করলে, রোযার দিনে ঘুমের অবস্থায় কোন কিছু আহার করলে, অথবা রোযার অবস্থায় পাথর, লোহা বা সীসার টুকরা বা এ জাতীয় কোন বস্তু গলাধঃকরণ করলে যা সাধারণত খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয় না বা ঔষধরূপেও সেবন করা হয় না এ সব ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। কিতু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খও)।

লোবান, আগর বাতি জ্বালিয়ে ইচ্ছাকৃত এর ধোঁয়া গ্রহণ করলে, হন্ধা, সিগারেট ইত্যাদি পান করলে, কাঁচা লাই যা রান্না করা হয়নি তা ভক্ষণ করলে, তাজা বা শুকনা আখরোট, শুকনো বাদাম, খোসাসহ ডিম, ছিলকাসহ আনার ও কাঁচা পেন্তা ভক্ষণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। শুকনো পেন্তাবাদাম চিবিয়ে ভক্ষণ করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। অবশ্য না চিবিয়ে গিলে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। খোসা ফাটা থাকলেও অধিকাংশ ফকীহ্র মতে এ হকুমই প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খও)।

চাউল, বাজরা, মণ্ডর, মাষকলাই ইত্যাদি ভক্ষণ করলে রেখা ভঙ্গ হবে ও কাষা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফাঁরা ওয়াজিব হবে না। দাঁতের ফাঁকে যদি কোন খাদ্যব্রব্য আট্কিয়ে থাকে আর তা সামান্য পরিমাণ হলে রোখা ফাসিদ হবে না। পরিমাণে বেশি হলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। চন্য বুট বা এর চেয়ে বড় কোন কিছু হলে একে বেশি বলে গণ্য করা হবে। এর চেয়ে ছোট বা কম হলে তা কম বলে ধর্তব্য হবে। এরপ কোন বস্তু মুখ থেকে বের করে হাতে নিয়ে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা তিল গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা এতা একেবারেই ক্ষুদ্র বস্তু। তবে এ জাতীয় বস্তু মুখের বাইরের থেকে নিয়ে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মতভেদ থাকলেও সহীহ্ মত হলো, না চিবিয়ে গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর চিবিয়ে গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য চিবানের পর গলায় স্থাদ অনুভূত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি গমের দানা চিবায় তবে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা এতো মুখেই বিলীন হয়ে যায়। অন্যকে খাওয়ানোর জন্য কেউ যদি খানা চিবায় এবং তা যদি মুখের ভেতর চলে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কায়া ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাহ্রীর লোকমা মুখে রয়ে গেলে এবং ফজর উদিত হওয়ার পর তা গলাধঃকরণ করলে তার রোযা ভঙ্গ হবে ও কাযা ওয়াজিব হবে। আর যদি মুখ থেকে বের করে পুনরায় খায় তাহলে কাযা কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। অন্যের থু থু গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তির থু থু গলাধঃকরণ করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। নিজের মুখের থুথু বেশিই হোক তা গলাধঃকরণ করলে রোযার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের থুং হাতে নিয়ে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করলে রোযার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের থুং হাতে নিয়ে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি কথা বলার সময় অথবা অন্য কোন সময় মুখের থুথুতে রোযাদার ব্যক্তির ওষ্ঠন্বয় ভিজে যায় অতঃপর সে যদি তা গিলে ফেলে তাহলে তার রোযা ফাসিদ হবে না। যদি লালা মুখ থেকে থুতনি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর যোগসূত্র মুখের মধ্যে থাকে এমতাবস্থায় উক্ত লালা মুখে টেনে নিয়ে তা গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে না। কিন্তু মুখের সাথে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলে এবং তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোগের কারণে যদি কারো মুখ থেকে লালা নির্গত হয়ে মুখে পুনঃ প্রবেশ করে এবং হলকুমে ঢুকে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। রক্ত পান করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে হলকুমে ঢুকলে যদি থুথুর পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ক্ষতি নেই। আর রক্তের পরিমাণ বেশি হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। সমান সমান হলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রেশমের রঙ্গের কাজ করার সময় যদি রেশম মুখের ভেতর ঢুকে এবং মুখের থুথু রঙ্গিন হয়ে যায় তবে এ থুথু গলাধঃকরণ করলে এবং এ সময় রোযার কথা শরণ থাকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি বা বরফের পানি গলার ভেতর ঢুকলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় চেনেরের দুই-এক ফোঁটা পানি মুখে ঢুকলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু চোখের পানির পরিমাণ বেশি হলে এবং সম্পূর্ণ মুখে এর লবণাক্ততার স্বাদ অনুভূত হলে আর সে পানি গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বমি হওয়ার পর তা পুনরায় গিলে ফেললে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। নাকে নস্য গ্রহণ করলে, কানে তৈল ঢাললে অথবা পায়খানার রাস্তায় ভূস নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমণীরী, ১ম খও)।

কোন মহিলা যদি তার যোনি পথে কোন তরল পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা করে প্রবেশ করায় তবে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পেট বা মাথার যথমে ঔষধ ব্যবহার করার পর তা যদি পেটে বা মাথার ভেতরে চুকে যায় তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ভেতরে না চুকলে রোযা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য তরল ঔষধ ব্যবহার করার পর তা ভেতরে চুকছে কি চুকেনি নিশ্চিতভাবে না জানা গেলে ইমাম আবৃ হানীফা (র)-এর মতে এ অবস্থায়ও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তরল ঔষধ স্বভাবতই ভেতরে চুকে যায়।

যদি কারে। পেটে তীর বা বর্ণা ইত্যাদি বিদ্ধ হয়ে পেটের ভেতরে থেকে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে তীর বা বর্ণার চিছু অংশ বাইরে থেকে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে না। সুতা দিয়ে বাঁধা গোশ্তের টুকরা গিলে তৎক্ষণাৎ তা বের করে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সাথে সাথে বের না করে রেখে দিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পানি বা তৈল দ্বারা ভিজ্ঞানো আঙ্গুল মলদ্বারে অথবা মহিলার যোনিদ্বারে ঢুকানো হলে, পানি বা তেল ভিতরে প্রবেশ করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রোযার কথা শারণ থাকা অবস্থায় এরপ করা হলে সেক্ষেত্রে এ হকুম প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মলত্যাগের সময় রোযাদার ব্যক্তির বসা অবস্থায় মলদার বেরিয়ে আসলে পানি ব্যবহারের পর ঐ পানি না মুছে দাঁড়ালে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ তাতে গুহাদার দিয়ে পেটের ভিতর পানি প্রবেশের অশংকা থাকে।

ফকীহ্গণ একথাও বলেছেন যে, রোযাদার ব্যক্তি ইস্তিনজা করার সময় শ্বাস গ্রহণ করবে না। কেননা এতে পেটের ভিতর পানি ঢোকার আশংকা আছে। রোযাদার ব্যক্তি যদি ইস্তিনজার সময় এত বেশি পানি ব্যবহার করে যে, যাতে পানি মলম্বারের ভেতরে ঢুকে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রোযা অবস্থায় কাউকে জ্বেন্সূর্বক সঙ্গম করানো হলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না অনুরূপ কোন মহিলা যদি কোন পুরুষকে জোরপূর্বক সঙ্গম করতে বাধ্য করে তাহলে উক্ত পুরুষের উপরও কাযা ওয়াজিব হবে। কিতু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। স্ত্রীকে চুম্বন করার পর বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিতু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। স্ত্রী স্বামীকে চুম্বন করলে যদি আর্দ্রতা দেখতে পায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ অর্দ্রতা না দেখে শুধু তৃপ্তি অনুভূত হলেও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র)-এর মতে রেয়া ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র) ভিনু মত ব্যক্ত করেছেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

নিজ দ্রীকে স্পর্শ করা, একরে মিলিতভাবে শয়ন করা, মুসাফাহা করা এবং মুখানাকা করা—এগুলো সর চুমু দেওয়ার মতই অর্থাৎ দ্রীকে চুমু দিলে যে হুকুম হয় এ সকল ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কাপড়ের উপর দিয়ে দ্রীকে স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি দ্রীর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করে তালে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। রোযা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি হন্তমৈপুন করে এবং এতে বীর্য নির্গত হয় তবে তার উপর কাষা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ দ্রীর দ্বারা হন্তমৈপুন করিয়ে বীর্যপাত করানো হলে তাতেও রোষা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাহ্রী খাওয়ার পর পান মুখে ঘূমিয়ে পড়লে এবং সুবহে সাদিকের পর জ্ঞাত হলে এ রোযা সহীহ্ হবে না। কাষা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ভাতার খানিয়া, ১ম খণ্ড)।

ঘুমন্ত মহিলার সাথে সহবাস করলে মহিলার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে এবং পুরুষের উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। ক্ষণে ভাল ক্ষণে পাগল এ জাতীয় কোন মহিলা যদি সুস্থ অবস্থায় রোযার নিয়ত করে এবং পরে যদি তার সাথে কেউ যিনা করে তবে তার উপরও কাযা ওয়াজিব হবে এবং পুরুষের উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী, ১ম ২ও)।

যদি কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভূলে পানাহার বা দ্রী সহবাস করার পর রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইঙ্ছাকৃতভাবে পুনরায় পানাহার করে তবে তার রোযা অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

বমি হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করলে রোযা অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাতে কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর এতে রোযা ভঙ্গ হয় না এ কথা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত রোযা ছেড়ে পানাহার করলে তাতে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। স্বপুদেষ হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করলে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য স্বপুদোষের হুকুম জানা সত্তেও এরপ করলে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রম্যান মাসে কোন কারণবশত যদি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলেও দিনের বেলায় রোযাদারের ন্যায় পানাহার বন্ধ রাখা ওয়াজিব (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়

রম্যান মাসে নিয়ত করে রোযা রাখার পর ওজর ব্যতীত স্বেচ্ছায় তা ভঙ্গ করলে ঐ রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। মলদ্বার বা যোনিদ্বার দিয়ে যৌনচারিতায় লিও হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। বীর্যপাত হোক বা না হোক কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। মহিলা যদি স্বেচ্ছায় পুরুষের সাথে এ কাজে লিও হয় তবে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই এ হকুম প্রযোজ্য হবে। জোরপূর্বক আরম্ভ করার পরে মহিলা যদি স্বেচ্ছায় এ কাজে রাযী হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রেও কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে। কোন মহিলা যদি কোন বালক বা পাগলকে সুযোগ দেয় এবং তারা যদি তার সাথে যিনা করে তবে উক্ত মহিলার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য বা ঔষধ গ্রহণ করলে কায়া ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্য বা পানীয় জাতীয় কোন কিছু পানাহার করে তাহলে কায়া ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

যে সব গাছের পাতা সাধারণত ভক্ষণ করা হয় তা ভক্ষণ করলে কাযা ও কাফ্ফার উভয় ওয়াজিব হবে। শাক-সন্ধির হুকুমও অনুরূপ। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

তথু লবণ খেলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানোর পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

চোখে সুরমা ব্যবহার করা অথবা শরীরে বা গোঁফে তৈল মাখার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। মিস্ওয়াক করার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাষা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

পরনিন্দা করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

কোন ঘুমন্ত মহিলার সাথে সহবাস করা হলে পুরুষের উপর কাষা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (শামী)।

রমযান মাসে রোযার নিয়ত করে রোযা আরম্ভ করে ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। রমযান ছাড়া অন্য কোন রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ রমযানের রোযার নিয়ত করার পূর্বে রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

যে সব কারণে রোযা ডঙ্গ হয় না

রোযাদার ব্যক্তি যদি ভূলক্রমে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করে তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয় না। এ ক্ষেত্রে ফরয় ও নফল রোযার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি রোযাদার ব্যক্তিকে ভূলবশত পানাহার করতে দেখে এবং তাকে সবল ও রোযা রাখতে সক্ষম মনে করে সে ক্ষেত্রে তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। স্বরণ না করানো মাকরহ তাহরিমী। আর যদি তাকে দুর্বল মনে হয় তবে তাকে রোযার কথা শ্বরণ না করানোও জায়েয় আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযার দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপুদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কোন মহিলার প্রতি কামভাবের দৃষ্টিতে তাকানোর ফলে বীর্যপাত ঘটলে রোযা ভঙ্গ হবে না। রোযা অবস্থায় সুরমা, তৈল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলেও রোযা ভঙ্গ হয় না (কুদ্রী)।

দাঁতের ফাঁকে চনা বুটের চেয়েও ছোট কোন বস্তু আটকিয়ে থাকলে এবং তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা তিল গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। গমের দানা চিবালে এতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

রোগ-ব্যাধির কারণে মুখ থেকে পানি নির্গত হয়ে থুথুর সাথে পুনরায় মুখের ভেতর চুকলে রোহার কোন ক্ষতি হবে না। কুলি করার পর মুখের ভিতর যে পানি লেগে থাকে তা থুপুর সাথে গলাধঃকরণ করলে তাতে রোষা ভঙ্গ হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মস্তক থেকে কফ নাকে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে টেনে তা যদি গলাধঃকরণ করা হয় তবে তাতে রোযা নষ্ট হবে না। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে মিশে কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলে এবং খুথুর পরিমাণ বেশি হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। মশা-মছি রোযাদারের পেটে ঢুকলে রোযা নষ্ট হবে না। ধুলা বালি, ধোঁয়া বা ঔষধের স্বাদ রোযাদারের কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। দু'-এক ফোঁটা চোখের পানি গলার ভেতর ঢুকলে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। শরীরের ঘাম মুখে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। গোসলের পর দেহে ঠাগ্রা অনুভূত হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। চোখে ঔষধ দেওয়ার পর গলার ভিতর স্বাদ অনুভূত হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। চোখে সুরমা ব্যবহার করার পর থুথুতে সুরমার রং প্রকাশ পেলে অধিকাংশ ফকীহ্-এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না। অনুদ্ধপ ইঙ্গাকৃতভাবে বমি হলে সামান্য হোক বা মুখ ভরে হোক এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ ইঙ্গাকৃতভাবে সামান্য পরিমাণ বমি করলে তাতেও রোযা ভঙ্গ হবে না। আল্মগীরী, ১ম খণ্ড)।

কানের ভিতর ফোঁটা ফোঁটা করে পানি ঢাললে রোযা ভঙ্গ হবে না। পুরুষের প্রস্রাব নালীতে ফোঁটা ফোঁটা করে কোন কিছু ঢাললে ইমাম আবৃ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কোন যৌন কল্পনায় কামউত্তেজনার কারণে বীর্যপাত ঘটলে রোযা ভঙ্গ হবে না। মহিলা তার স্বামীকে স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে তাতেও রোযা ভঙ্গ হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় কাঠি দ্বারা কান চুলকানোর পর কান থেকে ময়লা বের হলে রোযা ভঙ্গ হবে না (মারাকিল ফালাহ্)।

কারো স্বামী বদ মেজাজী হলে এবং তরকারিতে লবণ কমবেশি হওয়ার ফলে তার প্রতি জুলুম করার আশংকা থাকলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তরকারির লবণ দেখে নেওয়াতে রোযা নষ্ট হবে না (বিকায়া, ১ম ২৪)। অনন্যোপায় হলে খাদ্য চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়া জায়েয আছে। এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। পরে মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে (শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় মিস্ওয়াক করা জায়েয। এতে রোযা নষ্ট হয় না (মারাকিল ফালাহ, ১ম খণ্ড)।

এমনকি যদি নিমের কাঁচা ডালের দ্বারা মিস্ওয়াক করা হয় এবং এতে এর তিক্ততার স্বাদ মুখে অনুভূত হয় তবেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

রমযানের রাতে গোসল ফরয হওয়ার পর দিনে গোসল করলে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি সারাদিন গোসল না করলেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য ফরয গোসল অকারণে দেরিতে করা গুনাহের কাজ (নূরুল ঈযাহ্)।

রোযা অবস্থায় যে সব কাজ মাকরহ

রোযা অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো মাকরহ ঃ

- ১. রোযা অবস্থায় গন্ধ জাতীয় বস্তু চিবানো,
- ২. विना ওযরে কোন কিছু চিবানো বা কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা.
- ৩. কোন বন্তু খরিদ করার সময় জিহ্বা দ্বারা এর স্বাদ গ্রহণ করা। যেমন মধু, তৈল ইত্যাদি,
- শৌচকর্ম সম্পাদনে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা.
- কুলি করার সময় গড়গড়া করা এবং নাকে পানি দেওয়ার সময় নাকের ভেতর
 পানি টেনে নেওয়া,
- ৬. পানিতে নেমে গোসল করার সময় বায়ু নির্গত করা,
- ৭. মুখে থুথু জমিয়ে তা গিলে ফেলা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড).
- ৮. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ন্ত্রীর নফল রোযা রাখা,
- কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে না করলে এ অবস্থায়
 রীকে চ্বন করা বা তার সাথে কোলাকুলি করা.
- ১০. যে কাজ করলে রোযাদার দুর্বল হয়ে রোযা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এমন কাজ করা। যেমন শিংগা লাগানো অথবা অত্যধিক কট্টসাধ্য কোন কাজ করা (মারকিল ফালাহ্ ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড),
- ১১. এমন বিলম্বে সাহ্রী খাওয়া যে, সময়ের ব্যাপারে সন্দেহ এসে যায় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড),
- ১২. রোষা অবস্থায় কয়লা বা মাজন দারা দাঁত মাজা,
- ১৩. বিনা ওযরে রোযা অবস্থায় শিশু সন্তানের খাওয়ার জন্য কোন কিছু চিবিয়ে দেওয়া (মারাকিল ফালাহ্)।

রোযা অবস্থায় যেসব কাজ মাকরহ নয়

রোযা অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা মাকরহ নয় ঃ

- মিস্ওয়াক করা। রোযা অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যা তথা সব সময় মিস্ওয়াক করা।
 জায়েয়। কাঁচা বা শুকনা য়ে কোন ধরনের ডাল দ্বারা মিস্ওয়াক করা যাবে।
- চোখে সুরমা ব্যবহার করা। এবং গোঁফে তৈল মালিশ করা। যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকে ভবে এগুলো ব্যবহার করা জায়েয়। আর যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকে ভবে মাকরহ।
- ৩. শিংগা লাগানো। যদি তাতে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা না থাকে তবে তা মাকরহ হবে না। আর যদি দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকে তবে মাকরহ হবে। তাই দিনে শিংগা না লাগিয়ে সূর্যান্তের পর শিংগা লাগানো শ্রেয়।
- রোযা অবস্থায় ব্রীকে চ্য়ন করা বা তার সাথে কোলাকুলি করা, যদি এতে
 সহবাসে লিপ্ত হওয়া বা বীর্যপাত হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে
 (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।
- ৫. রোযা অবস্থায় কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়া,
- ৬. গোসল করা,
- ৭. শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা (মারাকিল ফালাহ)
- ৮. স্বামী বদ মেজাজী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা খাদ্যের স্বাদ চেখে দেখলে রোযা মাকরহ হবে না।
- ৯. অনন্যোপায় অবস্থায় রোযাদার মা কোন কিছু চিবিয়ে শিশুকে আহার করালে রোযা মাকরহ হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যে সব ওযরে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

কেউ যদি রোযা অবস্থায় হঠাৎ এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, রোযা রাখলে জীবন নাশের আশংকা দেখা দিতে পারে বা রোগ বেড়ে যেতে পারে এ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেওয়া, ক্ষুধা বা পিপাসায় প্রাণ যায় এরূপ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়েয (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও মারাকিল ফালাহ্)।

রোযা অবস্থায় গর্ভবতী মহিলার যদি নিজের বা সন্তানের প্রাণ-নাশের আশংকা হয় তবে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয (শরহুল বিদায়া)।

কন্টসাধ্য কোন কাজের কারণে কাতর হয়ে যদি ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দেয় তবে রোযা ছেড়ে দেওয়া দুরন্ত আছে। অবশ্য রোযাদার অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন ছাড়া স্বেচ্ছায় এরূপ কঠিন কাজে লিপ্ত হওয়া গুনাহের কাজ।

উপরোক্ত অবস্থায় ওয়রের কারণে রোয়া ছেড়ে দিলে পরবর্তী সময়ে তার কায়া করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)। রোযা অবস্থায় যদি এমন ক্ষুধা বা পিপাসা লাগে যে, প্রাণনাশের আশংকা দেখা দেয় অথবা জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়ে যায় তবে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ওযরের কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়েয়। অবশ্য পরে তা কাযা করে নিতে হবে। যিয়াফতও এক ধরনের ওযর। অতএব মেযবান যদি আহার না করলে অসভুষ্ট হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয়। পরে কায়া করে নিতে হবে। অবশ্য মেযবান যদি তথু উপস্থিতির উপর সভুষ্ট থাকে এবং আহার করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি না করে তবে রোযা ভঙ্গ করবে না।

শামসুল আইমা হলওয়ানী (র) বলেন,পরে কায় করতে পারবে বলে ইয়াকীন থাকলে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হবে। যদি কায়া করতে পারবে বলে ইয়াকীন না থাকে তাহলে মেযবানের কট হওয়া সত্ত্বেও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। দ্বিপ্রহরের আগে এরূপ অবস্থা ঘটলে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পরে ঘটলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হবে না তবে পিতামাতা অথবা স্বামীর নির্দেশে দ্বিপ্রহরের পরও নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। কাযা ও ওয়াজিব রোযার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণসমূহ ওযর হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যে সব কারণে রোযা না রাখা জায়েয

সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি আরোপ করেন না। এটাই তাঁর নিয়ম। কাজেই মায়্র লোকদের জন্য রমযান মাসে রোযা না রেখে পরবর্তী সময় রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। সফর, অসুস্থতা, গর্ভবতী হওয়া, দৃশ্বপোষ্য শিতকে স্তন্য দান, হায়িয নিফাস, অথবা অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে রম্যান মাসে রোযা না রাখা জায়েয়।

কেউ যদি রমযান মাসে আটচল্লিশ মাইল সফরের নিয়তে সুবহে সাদিকের পূর্বে নিজ বাড়ি থেকে বের হয় তবে সফরের অবস্থায় তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। পরে এর কাযা করতে হবে। দিনের বেলা সফর আরম্ভ করলে ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নেই রোযা রেখে সফর ওরু করত রোযা ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। বাড়িতে অবস্থানকালে রোযা রাখার পর রোযা ভঙ্গ করে সফর আরম্ভ করলে কাযা কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

দিনের প্রথমাংশে স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার পর কেউ যদি জোরপূর্বক সফরে প্রেরণ করে সে ক্ষেত্রে কাফ্ফারা রহিত হবে না। রমযান মাসে রোযাদার অবস্থায় সফরে বের হওয়ার পর কোন প্রয়োজনে বাভিতে প্রত্যাবর্তন করে দিনের বেলা পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোযা রাখা যদি মুসাফিরের কট্ট না হয় এবং অধিকাংশ সফর সঙ্গী যদি রোযাদার হয় আর তাদের ব্যয় যদি যৌথভাবে নির্বাহ না করা হয় তবে রোযা রাখা উত্তম। পক্ষান্তরে যদি রোযা রাখা কট হয় এবং সফর সঙ্গীরা যদি রোযাহীন হয় অথবা তাদের ব্যয় যদি যৌথভাবে নির্বাহ করা হয় তাহলে রোযা না রাখাই উত্তম। সফরের অবস্থায় রোযা রাখায় প্রাণনাশের আশংকা হলে রোযা না রাখা ওয়াজিব (মারাকিল ফালাহ্)।

রোগীর জন্য রমযান মাসে রোযা না রাখা জায়েয়। অসুস্থ ব্যক্তি যদি প্রাণনাশের অথবা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তবে তার জন্য রোযা না রাখা জায়েয়। যদি রোগ বেড়ে যাওয়া অথবা রোগ দীর্ঘ স্থায়ী হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলেও রোযা না রাখা জায়েয়। পরে এর কাষা করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়ে রোগী নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে। তবে তা শুধু অনুমান ভিত্তিক হলে গ্রহণযোগ্য হবে না বরং রোগের আলামত কিংবা অভিজ্ঞতা অথবা ফাসিক নয় এমন কোন বিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে নিশ্চিত ধারণা হলেই এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কোন সৃষ্থ ব্যক্তির প্রবল আশংকা জাগে যে, রোযা রাখলে সে অসুষ্থ হয়ে পড়বে তবে তার জন্য উপরোক্ত রোগীর হুকুম প্রযোজ্য হবে। পালা জ্বরে আক্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট দিনে জ্বর আসার পূর্বে এই ওযরে রোযা ভঙ্গ করে পানাহার করার অবকাশ আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

গর্ভবতী হওয়া এবং স্তন্যদান করার ওষরেও রোযা না রাখা জায়েয। গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারিণী মহিলা যদি সন্তান অথবা নিজের প্রাণ বিপন্ন হওয়ার আশংকাবোধ করে তবে তাদের জন্য রোযা না রাখা জায়েয। পরে এ রোযা কায়া করে নিবে। তাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

হায়িয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয় নেই। রোযা রাখার পর হায়িয় আসবে ধারণায় কোন মহিলা যদি রোযা ভেঙে ফেলে পরে তার হায়িয়ও আসল না তাহলে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। হায়িযের সর্বোচ্চ সময়সীমা দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর রাতে হায়িয় বন্ধ হলে সুবহে সাদিক হতে রোযা আরম্ভ করবে। যদি দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে হয়িয় বন্ধ হয় আর গোসলের পর সুবহে সাদিকের পূর্বে কিছু সময় পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে তার উপর এ দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব। গোসল সমাপ্ত করার সাথে সাথেই সুবহে সাদিক হয়ে গেলে রোযা রাখবে না তবে কোনরূপ পানাহার করবে না। বরং পূর্ণ দিন রোযাদারের ন্যায় কাটাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও আলজাওহারতুন নায়াারা)।

বার্ধক্যের কারণেও রোয়া না রাখা জায়েয়। অতিশয় বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তি যে রোয়া রাখতে সক্ষম নয় সে রোয়া না রেখে প্রতি রোয়ার পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে খাওয়াবে। বৃদ্ধা মহিলারও এ-ই হুকুম। অতিশয় বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। এ ফিদ্য়া রম্যানের

প্রথম দিকে বা শেষ দিকে যে কোন সময় ইচ্ছা এক সাথে আদায় করতে পারে : ফিদ্য়া আদায় করার পর রেযা রাখতে সক্ষম হলে সে দিনগুলোর কাযা করতে হবে এবং আদায়কৃত ফিন্য়ার হকুম বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি অসুস্থতা বা সফরের কারণে রমযানের রোযা ছুটে হায় এবং অসুস্থতা বা সফর অব্যাহত থাকে আর এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা যায় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য লে যদি মিস্কীনদেরকে খানা খাওয়ানের ওসীয়ত করে যায় তবে ওসীয়ত সহীহ হবে। যদিও তা তার উপরে ওয়াজিব হিল না। এমতাবস্থায় ওলী মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে মিস্কীনদের খাওয়াবে। রোগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাঁড়িতে আসার পর মৃত্যুর পূর্বে যদি এ পরিমাণ সময় পায় যে সময়ের মধ্যে ছুটে-যাওয়া রোযা কাযা করা যায় তবে ঐ সকল রোযার কাযা করা তার উপর ওয়াজিব। কায়া না করে থাকলে মৃত্যুর পূর্বে ফিদ্য়া প্রদান করার ওসীয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। ওলীকে সে ওসীয়ত আনায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রতি রোযার ফিদ্য়া এক এক ফিত্রার সমান কিন্তু ওসীয়ত না করলেও ওয়ারিসগণ ফিদ্য়া আদায় করে দিতে পারে। যদিও তা তাদের উপর আনায় করা ওয়াজিব নয়। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওলী বা ওয়ারিসের অন্য কারোর রোয় রাখা জায়েয় নেই (আলমগীরী, ১ম খও)।

রোগী সুস্থ হওয়ার পর অথবা মুসাফির বাড়িতে ফিরে আসার পর মারা গেলে যতদিন সুস্থ ছিল বা বাড়িতে মুকীম ছিল তত দিনের কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে। বিগত রম্যানের ছুটে-যাওয়া রোযা কাযা করার পূর্বেই পুনরায় রম্যান মাস এসে যায় সেক্ষেত্রে রম্যানের রোযাই রাখতে হবে। রম্যানের শেষে বিগত বছরের ছুটে-যাওয়া রোযার কাযা করবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন মুজাহিদ যদি নিশ্চিতভাবে জানে যে, রমযান মাসে তাকে জিহাদ করতে হাব এমতাবস্থায় রোযা রাখার কারণে তার দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তার জন্য রোযা না রাখা জায়েয়। যদি পরে যুদ্ধ না হয় তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না কাযা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

'ইয়াওমুশ্ শক্'-এ রোযা রাখার হুকুম

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে ২৯শে শাবান সদ্যায় চাঁদ দেখা না গেলে অথবা চাঁদ দেখার সংবাদ শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণিত না হলে পরের দিনটি শাবান মাসের না রম্যানের তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তাই সেদিনটিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ইয়াওমুশ্ শক্' (সন্দেহের দিন) বলা হয়।

ইয়াওমুশ শক[্]-এ রমযানের ফরয নিয়তে অথবা কোন ওয়াজিব নিয়তে অথবা এরপ শ্বিশাযুক্ত নিয়তে রোযা রাখনে তা মাকরাহ হবে।

যদি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ নফলের নিয়তে রোযা রাখে অথবা আদত অনুযায়ী নফল রোযা রাখে তাহলে মাকরহ হবে না। 'ইয়াওমুশ্ শক'-এ (২৯শে শা'বান) রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে বিধান

* নিম্নরপ ঃ

১. রম্যানের নিয়তে রোযা রাখা ঃ

'ইয়াওমুশ্ শক'-এর রমযানের রোযার নিয়তে রোযা রাখা মাকরহ। যদি কেউ এই দিনে রোযা রাখে এবং প্রমাণিত হয় যে দিনটি রমযানেরই তবে রোযাটি রমযানের ফর্য রোযা বলে গণ্য হবে। আর যদি দিনটি শা'বানের বলে প্রমাণিত হয় তবে ঐ রোযাটি নফল বলে গণ্য হবে। এবং তা ভঙ্গ করলে কাযা করতে হবে না।

২, রমযান ছাড়া অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়তে রোযা রাখা ঃ

'ইয়াওমুশ্ শক'-এ কোন ওয়াজিব রোযার নিয়তে রোযা রাখা মাকরহ। যদি কেউ তা রাখে এবং প্রমাণিত হয় যে, দিনটি রমযানের তবে তা রমযানের ফরয রোযা বলে গণ্য হবে। আর দিনটি শা'বানের বলে প্রমাণিত হলে তখন যে নিয়তে রোযা রাখা হয়েছে তাই আদায় হবে।

৩. নফলের নিয়তে রোযা রাখা ঃ

যদি কারো পুরো শা'বান মাস অথবা শা'বানের শেষ তিনদিন রোযা রাখার অভ্যাস থাকে তবে তার জন্য 'ইয়াওমুশ্ শক'-এ রোযা রাখা উত্তম। মুফ্তী-ফকীহ্গণের জন্য এই দিনে রোযা রাখা উত্তম। আর সর্বসাধারণ 'ইয়াতমুশ্ শক্'-এ দুপুর পর্যন্ত পানহার বর্জন করে দিনটি রমযানের প্রমাণিত না হলে রোযা রাখবে না।

8. রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দের সাথে রোযা রাখা ঃ

'ইয়াওমুশ্ শক্'-এ যদি কেউ এরূপ নিয়ত করে যে যদি দিনটি রমযানের হয় তবে রোযা রাখব না। এরূপ দ্বিধাযুক্ত নিয়তে পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকলে তা রোযা বলে গণ্য হবে না।

৫ কোন্ প্রকারের রোযা রাখবে এনিয়ে দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় রোযা রাখা ঃ

ইয়াওমুশ্ শক্'-এ যদি এরপ নিয়ত করে যে, যদি দিনটি রমযানের হয় হবে আমার এ রোযা হবে রমযানের হর্য রোযা আর যদি দিনটি শা'বানের হয় তবে তা হবে জন্য কোন ওয়াজিব রোযা। এরপ নিয়তে এদিন রোযা রাখা মাকরহ। পরে দিনটি রমযানের বলে প্রমাণিত হলে রোযাটি রমযানের ফর্য রোযা বলে গণ্য হবে আর দিনটি শাবানের প্রমাণিত হলে রোযাটি নফল বলে গণ্য হবে, অন্য কোন ওয়াজিব হিসাবে নয়। অবশ্য এই নফল রোযা ভঙ্গ করা হলে তার কায়া ওয়াজিব হবে না।

যদি কেউ এরপ নিয়ত করে যে, দিনটি রম্ফানের হলে রম্যানের ফর্য রোযা আর শা'বানের হলে নফল রোযা। এরপ নিয়তেও রোযা রাখা মাকরহ। তবে এ অবস্থায় দিনটি রমযানের প্রমাণিত হলে রোযাটি রমযানের ফর্য রোযা হিসাবে গণ্য হবে। আর দিনটি শাবানের প্রমাণিত হলে রোযাটি নফল বলে গণ্য হবে। এ নফল রোযা ভেঙে ফেললে কাযা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

কাষা রোযা

যদি ওযরবশত রমযানের সব রোযা অথবা কয়েকটি রোযা ছুটে যায় তবে যথাশীঘ্র তার কাযা করতে হবে। বিনা কারণে কাযা করতে দেরি করলে গুনাহগার হবে। কাযা রোযা একাধারে কিংবা পৃথক পৃথক উভয় ভাবেই রাখা জায়েয (কুদুরী)।

কাষা রোষা রাখার ক্ষেত্রে দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা জরুরী নয়। যে কয়টি রোষা কাষা হয়েছে সে কয়টি রোষা রাখলেই যথেষ্ট হবে। যদি ঘটনাক্রমে দুই বা ততোধিক রমযানের কাষা একত্র হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রে বছর নির্দিষ্ট করেই নিয়ত করতে হবে যে, 'আমি অমুক বছরের রমযানের রোষার কাষা আদায় করছি' (শামী, ২য় খণ্ড)।

কাযা রোযার জন্য রাতে নিয়ত করা জরুরী। সুবৃহে সাদিকের পর কাযা রোযার নিয়ত করলে কাযা সহীহ্ হবে না বরং ঐ রোযা নফলরূপে গণ্য হবে। কাযা পুনরায় রাখতে হবে (কুদূরী)।

কোন ব্যক্তি যদি পূর্ণ রমযান পাগল অবস্থায় থাকে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর তাকে এ রোযার কাযা করতে হবে না। কিন্তু মাসের মধ্যখানে সুস্থ হয়ে গেলে পরবর্তী রোযাগুলো তাকে রাখতে হবে। সাথে সাথে পূর্বের দিনগুলোর কাযাও করতে হবে। কোন পাগল ব্যক্তি যদি রমযানের শেষ দিন দ্বিপ্রহরের পর সুস্থ হয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কেউ যদি রমযানের পূর্ণ মাস বেহুঁশ থাকে তবে সৃস্থ হওয়ার পর তাকে এ রোযার কাষা করতে হবে।

যদি কেউ রমযানের কোন একদিন সূর্যান্তের পর এ অবস্থায় বেহুঁশ বা পাগল হয় যে পরের দিন তার রোযা রাখার নিয়ত ছিল আর এই বেহুঁশী অবস্থায় যদি তার কয়েক দিন কেটে যায় জবে বেহুঁশ হওয়ার রাতের পরের দিন্টি রোযা বলে গণ্য হবে বাকি দিনগুলোর রোযা কাষা করতে হবে।

তবে যদি পরের দিনটির রোযা রাখার নিয়ত না থেকে থাকে তবে ঐ দিনের রোযারও কামা করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

যদি বেহুঁশ ব্যক্তিকে দিনের বেলায় ঔষধ সেবন করানো হয় এবং তা গলার ভিতর ঢুকে যায় তবে এই দিনের রোযাও কাযা করতে হবে (মুলতাকাল আবহুর)।

রোযার কাফ্ফরা সম্পর্কিত মাসাইল

রমযান মাসে রোযা রাখার পর বিনা ওযরে, ইচ্ছাকৃতভাবে তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। রোযার কাফ্ফারা যিহারের কাফ্ফারার মতই। কাফ্ফারা হলো, একটি গোলাম আযাদ করা। সম্ভব না হলে একাধারে ষাট দিন রোযা রাখা। তাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিস্কীনকে দু'বেলা আহার করানো।

গোলাম আযাদ করতে অক্ষম হলে একাধারে ষাটদিন রোযা রাখতে হবে। তেঙে তেঙে কিছু কিছু করে রোযা রাখা জায়েয় নেই। যদি ঘটনাক্রমে মাঝে দুই-একদিন বাদ পড়ে যায় তবে পুনরায় আরম্ভ করে ষাটটি পূর্ণ করতে হবে। তবে এই ষাট দিনের মধ্যে যদি কোন মহিলার হায়িয় আরম্ভ হয়ে যায় তবে পূর্বের রোযাগুলোও হিসাবে ধরা হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

নিফাসের কারণে যদি রোযা ভঙ্গ করতে হয় তবে পূর্বের রোযাসমূহ ধর্তব্য হবে না। নতুনভাবে পুনরায় ঘাটটি রোযা রাখতে হবে (শামী)।

রোগের কারণে যদি কাফ্ফারার রোযা ভঙ্গ করতে হয় সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে। যদি মাঝে রমযান মাস এসে যায় তবে রমযান মাসের পর কাফ্ফারার রোযা আদায় হবে না। নতুনভাবে আবার ষাটটি রোযা রাখতে হবে। (শামী)।

বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে কেউ যদি কাফ্ফারার রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে এর পরিবর্তে ধাটজন মিস্কীনকে পেটভরে দুই বেলা আহার করাতে হবে।

এই ষাটজন মিস্কীনের প্রত্যেকেই বালিগ হতে হবে। কোন নাবালিগকে কাফ্ফারার খাদ্য খাওয়ানো হলে তা হিসাবে গণ্য হবে না। এর পরিবর্তে সমসংখ্যক বালিগ মিস্কীনকে খাওয়াতে হবে। (শামী)।

খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেক মিস্কীনকে 'সাদাকাতুল ফিত্র' পরিমাণ চাল বা আটা বা এর মূল্য প্রদান করলেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (শামী)।

যার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে সে যদি অন্য কাউকে তার পক্ষ হতে কাফ্ফারা আদায় করার জন্য আদেশ করে এবং উক্ত ব্যক্তি তা আদায় করে দেয় তবে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে তার বিনা অনুমতিতে অন্য কেউ যদি তার পক্ষ হতে কাফ্ফারা আদায় করে তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

একজন মিসকীনকে ষাটদিন পর্যন্ত দু'বেলা আহরে করালে অথবা ষাট দিন পর্যন্ত একজন মিস্কীনকে ষাটবার সাদকায়ে ফিত্রের সমপরিমাণ গম বা এর মূল্য প্রদান করলে এতেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে (হিদায়া)।

একাধারে ষাট দিন আহার না করিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আহার করালেও কাফ্ফারা আদায় হবে (মারাকিল ফালাহ্)। ষাট দিনের গম বা আটা অথবা এর মূল্য হিসাব করে যদি একই দিনে তা কোন এক মিস্কীনকে প্রদান করা হয় তবে তাতে একদিনের কাফ্ফারা আদায় হবে বাকি উনষাট দিনের কাফ্ফারা পুনরায় আদায় করতে হবে (শামী)।

কোন মিস্কীনকে সাদাকায়ে ফিত্রের পরিমাণ হতে কম প্রদান করে তাতে কাফফারা আদায় হবে না। (বাহরুর রাইক)।

একটি রোষা ভঙ্গ করলে একটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে একাধিক রোষা ভঙ্গ করলেও একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হবে। একটি কাফ্ফারার পরিমাণ ষাট জন মিস্কীনকে দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে আহার করানো। কিন্তু কাষার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ একাধিক রোষা ভঙ্গ করার অবস্থায় প্রত্যেকটি রোষারই কাষা ওয়াজিব হবে। অবশ্য নুই রমষানের দু'টি রোষা ভঙ্গ করলে দু'টি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি কাফ্ফারা যথেষ্ট হবে না (শামী)।

ফিদ্য়ার মাসাইল

অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে অক্ষম অথবা এমন রুগু ব্যক্তি যার সুস্থতার আশা করা যায় না তানের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো তারা রোযার পরিবর্তে ফিদ্য়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে অথবা সাদাকায়ে ফিত্রের সমপরিমাণ গম, যব, খেজুর বা তার বাজার মূল্য কোন মিস্কীনকে প্রদান করবে (শামী)।

একটি পূর্ণ ফিদ্য়া একজন মিস্কীনকে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি একটি ফিদ্য়া ভাগ করে একাধিক মিস্কীনকে প্রদান করা হয় তবে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র)-এর মতে তাও দুরস্ত আছে (শামী)।

বৃদ্ধ যদি পুনরায় কখনো রোযা রাখার শক্তি ফিরে পায় অথবা নিরাশ রুণ্ণ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে এবং রোযা রাখতে সক্ষম হয় তবে যেসব রোযার ফিদ্য়া প্রদান করা হয়েছে পুনরায় এগুলোর কাযা করতে হবে। আর সে ফিদ্য়াটা সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে (শামী ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কারো যিম্মায় কাযা রোযা থাকলে সে যদি তার ওয়ারিসদেরকে ওসীয়ত করে যায় যে আমার এতগুলো রোযার কাযা আছে, তোমরা এ ফিদ্য়া আদায় করে দিবে। এরপ ওসীয়ত করে গেলে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার পর ঝণ পরিশোধ করে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দারা সম্পূর্ণ ফিদ্য়া আদায় করা সম্ভব হলে তা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে। ফিদ্য়ার পরিমাণ যদি তার অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি হয় তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদ দ্বারা যে পরিমাণ ফিদ্য়া আদায় করা হায় এ পরিমাণই আদায় করা ওয়াজিব হবে। অতিরিক্ত পরিমাণ ফিদ্য়া আদায় করা ওয়ারিসদের উপর

ওয়াজিব নয়। বাকি ফিদ্য়া আদায় করতে অতিরিক্ত যে সম্পদ লাগবে তার জন্য ওয়ারিসদের অনুমতি জরুরী হবে (শামী. ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত না করে যায় এবং এমতাবস্থায় যদি তার ওলী ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল থেকে তার নামায-রোযার ফিদ্য়া আদায় করে দেয় তবে তা জায়েয় হবে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো নিজগুণে তা কবৃল করে নিবেন এবং তার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত না করা অবস্থায় তার পরিত্যক্ত মাল থেকে ফিদ্য়া আদায় করা জায়েয় নেই। অনুরূপ ফিদ্য়ার পরিমাণ যদি তার মালের এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশি হয় তবে ওসীয়ত করা সত্ত্বেও ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া অতিরিক্ত ফিদ্য়া পরিত্যক্ত মাল দ্বারা পরিশোধ করা জায়েয় হবে না। অবশ্য যদি ওয়ারিসগণ সকলেই খুশি মনে অনুমতি দেয় তবে পরিত্যক্ত মাল থেকে ও অবশিষ্ট ফিদ্য়ার অবশিষ্ট আদায় করা জায়েয় হবে। কিন্তু নাবালিগ ওয়ারিসের অনুমতি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব বালিগ ওয়ারিসগণ যদি নিজেদের অংশ পৃথক করে নিয়ে তার থেকে ফিদ্য়ার অতিরিক্ত অংশ আদায় করে তবে জায়েয় হবে (শামী আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ওলীর জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে নামায ও রোযার কাযা আদায় করা গ্রহণযোগ্য নয়। সূতরাং কোন ওয়ারিস যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোযা রাখে বা নামায পড়ে এতে তার কাযা আদায় হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

রোযা পালনে অক্ষম এবং ফিদ্য়া আদায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও প্রকাশ্যে মানুষের সামনে পানাহার করা উচিত নয়।

মুসাফিরের রোযা

সফরে থাকাকালীন অবস্থায় মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখা জায়েয আছে। অবশ্য পরে এর কায়া করে নিতে হবে।

সফরের অবস্থায় রোযা রাখলে যদি কোন ক্ষতি না হয় তবে রোযা রাখা উত্তম। যদি ক্ষতি হয় তবে রোযা না রাখাই উত্তম (শারহুল বিদায়া ও নূরুল ইযাহ্)।

রোযা অবস্থায় দিনে সফর আরম্ভ করলে ঐদিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নেই, ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। সফর করার ইচ্ছায় সফরে বের হওয়ার পূর্বে কেউ যদি রোযা ভঙ্গ করে তার প্রতি কাযা কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হবে। রমযান মাসে সফর আরম্ভ করে কোন কিছু নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়িতে এসে পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

মুসাফির ব্যক্তি সফরে বের হওয়ার পর কোথাও পনের দিন বা ততোধিক দিন যদি অবস্থানের নিয়ত করে তবে সেখানে থাকাকালে রোযা না রাখা তার জন্য জায়েয নেই। অবশ্য পনের দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করলে রোযা না রাখা দুরন্ত হবে (শামী)। কোন ব্যক্তি সফর অবস্থায় রোযা রাখেনি। বাড়ি প্রত্যাবর্তন করে ঐ রোযার কাযা না করে কয়েক দিন পরেই মারা গেছে। এ ক্ষেত্রে যে কয়দিন সে জীবিতাবস্থায় বাড়িতে ছিল ঐ কয়েক দিনের কাযাই তার উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু পুরা রোযা কাযা করার মত সময় সে পায়নি। এ কয়দিনের ফিদ্য়া আদায়ের ওসীয়ত করে যাওয়া তার প্রতি ওয়াজিব।

সফর থেকে বাড়ি আসার পর যে কয়দিন সে জীবিত ছিল ছুটে যাওয়া রোযার সংখ্যা এরচেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত দিনগুলোর ফিদ্য়া আদায় করার জন্য ওসীয়ত করা তার উপর ওয়াজিব নয় (শারহুল বাদায়ে, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী)।

কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি সফরের অবস্থায় মারা যায় তাহলে সফরের কারণে তার যে কয়েকটি রোযা ছুটেছে এর ফিদ্য়া আদায় করার জন্য ওসীয়ত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, সে কাযা রোহা রাখার সময় পায়নি (শামী)।

ৰুগ্ন ব্যক্তির রোযা

অসুস্থ ব্যক্তি যদি জীবন বিপন্ন হওয়ার অথবা অঙ্গহানি ঘটার আশংকাবোধ করে তবে তার জন্য রোযা না রাখা জায়েয়। অনুরূপ রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা রোগ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা থাকলেও রুগু ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা জায়েয়। রোগের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সুস্থ হওয়ার পর তার কাযা করতে হবে। রোগী নিজে রোগের আলামত অথবা নিজের অভিজ্ঞতা কিংবা ধার্মিক বিজ্ঞ মুসনিম চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে রোগ বৃদ্ধি, জীবন বিপন্ন হওয়া বা অঙ্গহানির প্রবল ধারণা হলেই রোযা না রাখা তার জন্য জায়েয় হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রোগ আরোগ্য হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা থাকা অবস্থায় রোযা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে তবে এ অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয আছে (শামী)।

কেউ যদি পীড়িত অবস্থায় মারা যায় তবে রোগের কারণে তার যে সব রোযা ছুটে গিয়েছে তার ফিদ্য়া আদায় করার জন্য ওসীয়ত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা সে কাযা রাখার সময় পায়নি (শামী)।

রোগের কার্ণে কয়েক দিন রোয়া রাখতে সক্ষম হয়ন এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভের কয়েকদিন পর মারা যায় তাহলে যে কয়দিনের রোয়া তার ফাওত হয়েছে এ পরিমাণ সময় সে সৃস্থ থাকলে উক্ত দিনগুলোর ফিদ্য়া আদায় করার জন্য ওসীয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। আর যে কয়দিন সে সৃস্থ ছিল এর পরিমাণ যদি ছুটে যাওয়া রোয়ার অপেক্ষা কম হয় তবে যে কয়দিন সে সৃস্থ ছিল সে কয়দিনের ফিদ্য়া আদায় করার ওসীয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু অতিরিজ্ঞ দিনসমূহের ওসীয়ত করা তার উপর ওয়াজিব নয় (শামী ও আল্মগীরী, ১ম থও)।

মাযূর ব্যক্তির রোযা

যে সব অবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়র বলে স্বীকৃত এমন কোন ওয়র কারো মধ্যে পাওয়া গেলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'মাযূর' বলা হয়।

ও্যর দু'প্রকার হতে পারে ঃ

- ১. রোযা রাখার পর ওযর সৃষ্টি হওয়া,
- ২. রোযা আরম্ভ করার পূর্বে ওযর বিদ্যমান থাকা।

রোষা রাখার পর ওয়র দেখা দিলে যেমন— কেউ হঠাৎ এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, এতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয় এ অবস্থায় তার জন্য রোষা ছেড়ে দেয়া জায়েয়। এভাবে রোষা অবস্থায় যদি কোন মহিলার হায়িয় আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে এ অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা জায়েয় হবে না।

সফর, অসুস্থতা, গর্ভবতী হওয়া, দৃগ্ধ পান করান, হায়িয় নিফাস জারি হওয়া এবং অতিশয় বার্ধক্য ইত্যাদি শরীয়তের দৃষ্টিতে ওযর। এ গুলোর কোন একটি রোযার দিনের পূর্বে কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে মাযূর বলে গণ্য হবে। এবং এ অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয় হবে। তবে পরে এর কায়া করে নিতে হবে।

অতি বৃদ্ধের রোযা

রমযান মাসে যে সব ওযরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে বার্ধক্য জনিত কারণ তার অন্যতম। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে একেবারেই অক্ষম সে রমযানের প্রতিটি রোযার পরিবর্তে ফিদ্য়া স্বরূপ একজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে। বৃদ্ধ মহিলার ক্ষেত্রেও এ হকুম। এই ফিদ্য়া রমযানের প্রথম তারিখে এক সাথে আদায় করাও জায়েয়, শেষ তারিখে আদায় করাও জায়েয। কোন ব্যক্তি যদি ফিদ্য়া আদায়ের পর সৃস্থ হয় এবং রোযা রাখতে সক্ষম হয় তাহলে আদায়কৃত ফিদ্য়া বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য প্রদত্ত ফিদ্য়া সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারিণী মহিলার রোযা

গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারিণী মহিলা রোযা রাখার কারণে যদি নিজের কিংবা সন্তানের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা বোধ করে তবে তাদের রোযা না রাখা দুরস্ত আছে। পরে তার কাযা করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যে মাতা নিজ শিশুকে দুধ পান না করিয়ে ধাত্রীর দুধ পা<u>ন করান</u> সে মাতার জন্য রোষা পরিত্যাগ করা জায়েয় নয়।

কোন মহিলা যদি ধাত্রীর চাকুরী করে তবে স্তন্যদানকালে রমযান এসে গেলে রোযা না রেখে শিশুকে দুগ্ধপান করানো তার জন্য জায়েয় আছে। অবশ্য পরে এর কায়া করে নিতে হবে (শামী)।

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ও ডুস গ্রহণ

মুখ, নাক, কান, প্রস্রাব এবং বাহ্যদ্বার ইত্যাদির কোন একটি দিয়ে মস্তিষ্ক ও পাকস্থলিতে কোন কিছু প্রবেশ করলে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ সকল অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দেহাভান্তরে কোন কিছু প্রবেশ করানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

মুখ, নাক, কান, প্রস্রাব ও বাহ্যদ্বার ছাড়া কোন বিকল্প উপায়ে যদি সরাসরি পাকস্থলি অথবা মস্তিদ্ধে কোন কিছু প্রবেশ করানো হয় তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সরাসরি পাকস্থলি বা মস্তিদ্ধে না পৌছে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। অতএব গোশ্তে অথবা রগে কোন প্রকারের ইনজেকশনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। সেলাইন, গ্রুকোজ ইনজেকশন বা ইনজেক্শনের মাধ্যমে শরীরে রক্ত প্রবেশ করানো দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রোযা অবস্থায় এ জাতীয় ইনজেকশন না নেওয়া শ্রেয়।

ডুস ব্যবহার বা হাঁপানীর প্রকোপ নিরসনের জন্য গ্যাস জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের দারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)।

রোযা অবস্থায় মাজন বা পেস্ট ব্যবহার করা

ফকীহ্গণের মতে রোযা অবস্থায় শুকনা বা তাজা উভয় প্রকার ডাল দ্বারা মিস্ওয়াক করা জায়েয়। এতে হাল্কা স্বাদ অনুভূত হলেও কোন ক্ষতি হবে না।

রোযা অবস্থায় দিনের বেলা কয়লা, গুলের মাজন, টুথপেন্ট, পাউডার ইত্যাদি দারা দাঁত মাজা মাকরহ। এগুলোর কিছু অংশ যদি গলার ভিতর চলে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)।

রোযা অবস্থায় রক্ত দান অথবা রক্ত গ্রহণ

রোযা অবস্থায় প্রয়োজনবোধে শিংগা লাগানো জায়েয় । তবে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো মাকরহ হবে। এ কারণেই ফকীহ্গণ বলেন, সন্ধ্যার পর শিংগা লাগানো উত্তম (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কাজেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা রক্ত দানের উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এতে শরীরিক দুর্বলতার আশংকা থাকলে মাকরুহ হবে। তাই দিনে রক্ত না দিয়ে রাতে দেওয়াই উত্তম। রোগ-ব্যাধির কারণে কারো রক্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)

রোযা অবস্থায় অপারেশন

মুখ গহরর, নাক ও কানের অভ্যন্তর ভাগ, প্রস্রাব ও বাহ্য ইন্রিয়ের অভ্যন্তরে, মন্তিষ্ক ও পাকস্থলির যে কোন স্থানে অপারেশন করে কোন অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এসকল অঙ্গে অপারেশনের পরে ঔষধ বা অন্যকোন কিছু প্রবেশ করানো হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। উপরোক্ত ইন্রিয়গুলি ছাড়া শরীরের যে কোন স্থানে অপারেশন করলে এবং ঔষধ বা অন্য কোন কিছু প্রবেশ করানো হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

তীর বা বর্শা টেটা বিদ্ধ হওয়ার পর যদি এর পূর্ণ ফলা পেটের ভিতরই রয়ে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এর কিছু অংশ পেটের বাইরে থেকে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। পাকস্থলির অপারেশনের সময় যদি তার কোন অংশ বের করে পুনঃ তা সংযোজন করা হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন বমি মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তা পুনঃ উদরস্থ করা হলে অথবা মুখের থুথু হাতে জমা করে পরে তা খেয়ে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় (জানীন ফিকহী মাসাইল)।

ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার

দুই প্রকারের ক্ষত যাতে ঔষধ ব্যবহার করাকে ফকীহ্গণ রোযাভঙ্গকারী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেনঃ

ك. আभ (مانفة) ২. জায়িফা (جائفة) ا

মাথার উপরিভাগের গভীর ক্ষত যা মন্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে গেছে তাকে 'আমা' বলা হয়। এতে ঔষধ ব্যবহার করলে ঔষধ মন্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে যায়। আর জায়িফা (নাট্র) পেটের ঐ গভীর ক্ষত যা পাকস্থলিতে পৌছে গেছে। এতে ঔষধ ব্যবহার করলে ঐ পাকস্থলি পর্যন্ত পৌছে যায়। উপরোক্ত জখমহয় দ্বারা ঔষধ যেহেতু সরাসরি পাকস্থলি বা মন্তিষ্কে পৌছে যায় তাই এই দুই ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ছাড়া শরীরের অন্য কোন জখমে ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী, শামী)

অর্শ্ব রোগের বটি সাধারণত বাহ্যদ্বার থেকে কিছু নিচে গজিয়ে থাকে। তাই অর্শ্বের বটিতে বরফ দ্বারা সেক দিলে অথবা এতে জমাট কোন ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। শিশু এর্শ্বের বটিতে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে এর কিছু অংশ যদি ভিতরে চলে যায় তবে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আহ্সানুল ফাতাওয়া)।

চোথের ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করলে এবং ঔষধের স্থাদ গলায় **অনুভূত হলেও** রোযা ভঙ্গ হবে না (শামী, ২য় ২ও ও আহসানুল ফততওয়া, ৪র্থ খণ্ড)। আধুনিক যুগের কোন কোন ফকীহ চোখে তরল ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোযা ভঙ্গ হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, শারীর বিজ্ঞানীদের মতে চোখের ছিদ্রির সাথে গলার সরাসরি সংযোগ রয়েছে। তাই চোখে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে তা গলায় পৌছে যেতে পারে।

রোযা অবস্থায় দাঁত সংযোজন এবং ঔষধ ব্যবহার

রোযা অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে দাঁত উণ্ডোলন বা নতুন দাঁত সংযোজনের ফলে রোযা ভঙ্গ হয় না। প্রয়োজনে দাঁতে ঔষধ ব্যবহার করাও জায়েয়। বিনা প্রয়োজনে তা মাকরহ। যদি রক্ত বা ঔষধ পেটের ভিতর প্রবেশ করে এবং এর পরিমাণ থুথুর পরিমাণের চেয়ে বেশি বা সমান হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি থুথুর পরিমাণ রক্ত বা ঔষধের চেয়ে কম হয় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এ অবস্থায় যদি গলার ভিতর ঔষধের স্বাদ অনুভূত হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বায্যাযিয়া ও আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

কতিপয় জরুরী মাসাইল

নাবালিগ ছেলে-মেয়ে যদি রোযা রাখার পর তা ভঙ্গ করে তবে তাদের উপর এর কাষা ওয়াজিব নয়। কিন্তু নামায শুরু করার পর তা ভঙ্গ করলে তা পুনরায় আদায় করার জন্য তাদেরকে হুকুম করতে হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

রোযা অবস্থায় যদি কারো এমন ক্ষুধা বা পিপাসা লাগে যে, এতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে রোযা ভঙ্গ করে প্রাণ রক্ষা করা তার উপর ওয়াজিব। যদি রোযা ভঙ্গ না করে ক্ষুধা বা পিপাসায় মারা যায় তবে সে গুনাহগার হবে (বাদায়েউস্ সানায়ে আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ চাঁদ দেখা

চাঁদ দেখার গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশান করেন ঃ

লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে আপনি বলে দিন এটি মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের এবং হজ্জের সময় নির্দেশক (২ ঃ ১৮৯)।

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

যেন তোমরা (চাঁদ ও সূর্যের মাধ্যমে) বছর গণনা এবং সময়ের হিসাব জানতে পার (১০ঃ৫)।

এ আয়াত দু'টির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম ও ইবাদত বন্দেগীতে চাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত রমযান ও হজ্জের সময় নির্ণিত হয় চাঁদের সাহায্যে। রমযানের রোযা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرُ فَلْيَصِمُ وَالسَّامَةُ তামাদের মধ্য হতে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে রোযা রাখে (২ ঃ ১৮৫)।

হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারাও চাঁদের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। রাস্লুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ؛ صُوْمُوْ الرُوْيَتِهِ وَٱفْطِرُوْ الرُوْيَتِهِ وَٱفْطِرُوْ الرُوْيَتِهِ وَالْمُطْرُوْ الرُوْيَتِهِ وَالْمُطْرُونَ الرَّوْيَتِهِ وَالْمُطْرُونَ الرَّوْيَتِهِ وَالْمُعْرَافِينَ الْمُعْرَافِينَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

তাছাড়। চাঁদের মাধ্যমে বছর পূর্তিতে ফরয় হয় যাকাত, নির্ধারিত হয় দুই ঈদের দিন, আগুরা ও শবেবরাত, শবে কদরসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। তাই মুসলমানের জীবনে চাঁদ দেখার গুরুত্ব অপরিসীম।

রোযা ও ঈদের চাঁদ দেখা

শা'বানের উনত্রিশ তারিখ সূর্যান্তের সময় রমযানের চাঁদ উঠেছে কিনা তা দেখার ও জানার চেষ্টা করা ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড): এভাবে রময়ানের চাঁদের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য রজব মাস অন্তে শা'বানের চাঁদ তালাশ করাও ওয়াজিব। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ

তোমরা রমযানের হিসাব যথাযথভাবে রাখার জন্য শা'বানের চাঁদের পুরোপুরি হিসাব রাখবে (তিরমিযী)।

শা'বান ও রমযানের চাঁদ অন্তেষণ করা যেমন ওয়াজিব তেমনি রমযানের উনত্রিশ তারিথ অন্তে শাওয়ালের চাঁদ অন্তেষণ করাও ওয়াজিব। ঈদুল আযহা পালনে যেন কোন বিঘু সৃষ্টি না হয় তাই যিলকদ ও যিলহজ্জ এই দুই মাসের চাঁদ তালাশ করাও ওয়াজিব। শা'বান, রমযান, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ এই পাঁচ মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসের চাঁদ তালাশ করা ওয়াজিব নয় বরং মুম্ভাহাব। এভাবে প্রত্যেক মাসের চাঁদ দেখার জন্য যথাসময়ের পূর্বেই প্রস্তৃতি গ্রহণ করাও মুম্ভাহাব।

চাঁদ দেখার উপর রোযা ও ঈদের নির্ভরশীলতা

চাঁদের মাস কথনো উনত্রিশ দিনে হয় আবার কথনো ত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। তাই শা বানের উনত্রিশতম দিনে সূর্যান্তের সময় চাঁদ উদিত হওয়ার উপর পরবর্তী দিনের রোযা নির্ভরশীল। যদি ঐ দিনে চাঁদ দেখা যায় তাহলে পরবর্তী দিন থেকে রমযান মাসের রোযা রাখা ওক করতে হবে। আর যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ঐ শা বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ হবে। শা বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী দিন থেকেই রমযানের রোযা ওক্ব হবে। এ ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার উপর রমযানের রোযা ওক্ব করা নির্ভরশীল নয়। অনুরূপ রমযানের উনত্রিশ তারিখ সূর্যান্তের সময় শাওয়ালের চাঁদ দেখার উপর পরবর্তী দিনে ঈদ হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি এ সময়ে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় তবে পরবর্তী দিনে ঈদুল ফিত্র হবে আর যদি চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে রমযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরবর্তী দিনে ঈদুল ফিত্র হবে। এ ক্ষেত্রে চাঁদ দেখা না দেখার উপর ঈদুল ফিতর নির্ভরশীল নয়।

চন্দ্র উদয় প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদগণ প্রমুখের হিসাব নিকাশ ঘোষণা ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য নয়। তা তাদের নিজেদের বেলায়ও নয় এবং অন্যদের বেলায়ও নয় (আলমগীরী, ১ম ২৩)।

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় চারভাবে ঃ

- ১. কেউ নিজে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে।
- ২. কেউ চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদাতার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে।
- ৩. চাঁদের উদয় সম্পর্কে বিচারকের রায়ের স্থপক্ষে সাক্ষ্য দিলে এবং

- ৪. চাঁদ ওঠার ঘটনা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে চলে গেলে অর্থাৎ চাঁদ দেখার সংবাদ ব্যাপক হওয়ার কারণে তা সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণয়োগ্য হলে। প্রত্যেকটি অবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আবার আকাশে চাঁদ দেখার মাসআলা দুই ধরনের ঃ
- ১. আকাশে প্রতিবন্ধক থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা এবং
- ২. প্রতিবন্ধক না থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা। প্রথমত রমযানের চাঁদ সংক্রান্ত এই দুই ধরনের মাসআলা বর্ণিত হচ্ছে।

আকাশ মেঘাছর থাকা অবস্থায় রম্যানের চাঁদ দেখার বিধান

আকাশে চাঁদ ওঠার জায়গায় মেঘ বা ধূলার আন্তরণ ইত্যাদি প্রতিবদ্ধক থাকলে রমযানের চাঁদ এক ব্যক্তির সাক্ষ্যেই প্রমাণিত হবে। সে লোককে অবশ্যই মুসলমান, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন এবং প্রাপ্তবয়ঙ্ক হতে হবে। সে স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস, নারী হোক বা পুরুষ, তাতে সাক্ষ্য প্রদানে কোন তারতম্য হবে না এরপ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য সমপর্যায়ের গণ্য হবে (আলমণীরী, ১ম খণ্ড)।

মেঘ, ধূলার আন্তরণ, অন্ধকার, ধূলা, ধোঁয়া ও ধূলিঝড় ইত্যাদি কারণে সাধারণত আকাশে চাঁদ দেখার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদাতার পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিলে তার মধ্যেও সাক্ষ্যদাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা জরুরী। অতএব, এক্ষেত্রেও নারী বা পুরুষ হওয়া এবং স্বাধীন বা ক্রীতদাস হওয়ায় কোন পার্থক্য হবে না, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবৃদ্ধিসম্পন্ন আদিল মুসলমান হওয়া জরুরী হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার দায়ে বেত্রাঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাওবা করে, তাহলে তার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য বা সাক্ষীর সপক্ষে সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি সে তাওবা না করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেবল রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এ ধরনের ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, শাওয়াল, যিলহজ্জ ইত্যাদির চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে এই ধরনের লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, চাই সে দগুপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাওবা করুক বা না করুক (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

'মাসতুরুল হাল' অর্থাৎ যার নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা জানা নেই এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশুদ্ধ মতে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ক্রীতদাসের পক্ষে অপর এক ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, অনুরূপ এক মহিলার সপক্ষে অপর এক মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যে বালক-বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তবে নিকটবর্তী বয়সের তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। ফাসিক (যার মাঝে ন্যায়নিষ্ঠতা অনুপস্থিত এবং সংকার্য অপেক্ষা মন্দর্কর্ম অধিক) এমন লোকের রমযানের চাঁদ দেখার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান বা সাক্ষীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান অগ্রাহ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

রমযানের চাঁদ দেখার সা্চ্চ্য প্রদানকালে 'সাচ্চ্য দিচ্ছি' বা এর সমার্থক কোন শব্দ এবং নিজ সত্যতার দাবি প্রকাশক কোন শব্দ ব্যবহার করা জরুরী নয়। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি প্রশাসক সমীপে রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানকালে অন্য কেউ সে মাহফিলে উপস্থিত থেকে তা ভনলে তার জন্য রোযা রাখা ফর্ম হয়ে যাবে, প্রশাসকের ঘোষণা শোনার জন্য তার অপেক্ষা করা মোটেই জরুরী নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হতে চাঁদ দেখার বিস্তারিত বিবরণ শোনা জরুরী নয়। এক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি শহরের বাইরের লোক বা ভিতরের মাঠে গিয়ে বা বাড়ির ছাদে উঠে চাঁদ দেখেছে ইত্যাকার কোন বিবরণ শোনার ওপর তার সাক্ষ্য গ্রহণ নির্ভর করবে না (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমান রমহানের চাঁদ দেখে তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সে রাতেই কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তির নিকট এর সাক্ষ্য প্রদান করা (আল্মগীরী, ১ম খণ্ড)।

ফাসিক ব্যক্তি (অর্থাৎ যে আদিল নয়) সে যদি একা চাঁদ দেখে আর কেউ না দেখে তাহলে ইমাম বা কায়ীর নিকট এ বিষয়ে তার সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য । কেননা, কায়ী কখনো তার কথা গ্রহণ করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে কায়ীর কর্তব্য তার কথা গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করা। কোনভাবে যদি ফাসিক ব্যক্তির এই প্রতীতি জন্মায় যে, ইমাম বা কায়ী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন তাহলে তার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা গুয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কাষী বা ইমাম কোন ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য কবৃল করেন এবং সেমতে রোষা রাখার নির্দেশ জারি করেন তাহলে সকলের জন্যই রোষা রাখা ফরয হয়ে যাবে। এ সময় এই ব্যক্তি বা শহরের অন্য যে কোন ব্যক্তি রোষা রাখার পর তা তেঙে ফেললে কাষার সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে ফাসিকের সাক্ষ্য কবৃল না করে তা প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করা ইমাম ও কাষীর জন্য আবশ্যক ছিল। সাক্ষ্য প্রদানকারী যদি বিশ্বস্ত হয় তাহলেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খও ও শামী ২য় খও)।

আকাশ মেঘাছের না থাকা অবস্থায় রম্যানের চাঁদ দেখার বিধান

যদি রম্যানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক লোকের সাক্ষ্য অপরিহার্য হবে । যাদের সাক্ষ্য সভ্য বলে গ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধা থাকবে না এবং যাদের সকলের একত্রে মিখ্যা বলবে বলে ধারণা করার কোন অবকাশ থাকবে না ।

সাক্ষীদের নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই। বরং ইমাম বা কাষীর অন্তরে ইয়াকীন জন্মানোর জন্য যতজনকৈ তিনি যথেষ্ট মনে করেন তত জনের সাক্ষ্য তিনি সংগ্রহ করবেন। রমযান, শাওয়াল ও যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি রম্যানের উনত্রিশ তারিখে প্রশাসক বা কাযীর নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমরা আপনাদের একদিন পূর্বে রোযা রাখতে ওরু করেছি, তাহলে সাক্ষ্যদাতা কোন্ এলাকার অধিবাসী তা লক্ষ্য করতে হবে। যদি সেই শহরেরই লোক হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসক বা কাযী তার এ কথা গ্রহণ করবেন না। কেননা শহরের অধিবাসী হিসাবে তার জন্য যেদিন চাঁদ দেখেছে সেদিনই সাক্ষ্য প্রনান করা ওয়াজিব ছিল। যেহেতু সে সেই ওয়াজিব তরক করেছে তাই সে আর আদিল বলে পরিগণিত হবে না। বরং সে ফাসিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে আর সেই সাক্ষ্যদাতা যদি শহরের বাইরে দূরবর্তী এলাকার লোক হয়ে থাকে তাহলে তার একথা গ্রহণ করা হবে। এই বিধান বছরের সকল মাসের চাঁদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

আকাশ মেঘাচ্ছন থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান

রমযানের উনত্রিশ তারিথ সূর্যান্তের সময় চাঁদ অন্থেষণ করবে। যদি শাওয়ালের চাঁদ মাত্র এক ব্যক্তিই দেখতে পায় তাহলে সে রোযা রাখা ছাড়বে না এবং ত্রিশ তারিখেও রোযা রাখবে। কেননা, ইবাদতে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্জুনীয়। আর এখানে রোযা রাখাই হচ্ছে সতর্কতার প্রকাশ। যেহেতু তার একার চাঁদ দেখায় ভুল হওয়ারও আশংকা রয়েছে। তবে যদি সে রোযা না রাখে তাহলে তাকে শুধু ঐ রোযারই কাযা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি একা চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি কাষী বা প্রশাসকের নিকট সাক্ষ্য প্রদানের পর তা অগ্নাহ্য হয় তাহলে তার জন্য অন্যান্য মুসলমানের সাথে রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি সে রোযা না রাখে তাহলে তাকে ওধু কাষা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। কেননা তার চাঁদ দেখার হিসাবে রমযান মাস শেষ হয়ে গেছে। যদি কাষী বা প্রশাসক তার কথা প্রত্যাখ্যান করার পূর্বেই সে রোযা ছেড়ে দেয় তাহলেও তাকে ওধু কাষা আদায় করতে হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড):

যদি এই লোকের কথা বিশ্বাস করে অন্য কোন লোক রোযা ভেঙে ফেলে তাহলে তাকেও কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। কেবল কাযা আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)। যদি প্রশাসক বা কাষী একা শাওয়ালের চাঁদ দেখেন তাহলে এর ভিত্তিতে তিনি লোকদের ঈদ উদ্যাপনের নির্দেশ দিবেন না এবং নিজেও রোযা তরক করবেন না। কেননা শাওয়ালের চাঁদ একা একজনের দেখা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি আকাশে প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে ঈদুল ফিতরের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ

- ১. সাক্ষীদের আদিল (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) হওয়া,
- ২. আযাদ হওয়া,
- ৩. দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান করা,
- 8. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' বলে সাক্ষ্য প্রদান করা।
- ৫. অপবাদে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

উল্লিখিত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে কমপক্ষে দুইজন আযাদ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা যাদের কেউ মিথ্যা অপবাদের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়নি এবং যারা আদিল তারা 'আমি সাক্ষ্য দিছি' একথা বলে সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। একজন কাষী তাদের চাঁদ দেখার প্রতি স্বীকৃতি দিবেন। এরপর তিনি ঈদ উদ্যাপনের নির্দেশ প্রদান করবেন। কেবল মহিলাদের সাক্ষ্য যদি তারা সংখ্যায় অনেকও হয় তথাপিও তা গৃহীত হবে না। অনুরূপ গোলাম বা অপবাদে দঙ্প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাওবা করে তবুও তাদের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানে আরবী শব্দ 'আশ্হাদু' বা তার সম অর্থবাধক বাংলা, ইংরেজী বা অন্য যে কোন ভাষার শব্দ যে দেশে যে ভাষা প্রচলিত সে ভাষায় তার অর্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করতে পারবে। আরবী শব্দ 'আশ্হাদু' বলতে হবে, অন্য কোন ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না; এরপ ঠিক নয়। তবে সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থের শব্দ হলে তার দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা গৃহীত হবে না, যেমন আমি জানি বা আমি দৃচভাবে বিশ্বাস করি- এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগে সাক্ষ্য প্রদান করা হলে তা প্রহণযোগ্য হবে না। কেউ যদি আরবী শব্দ বলতে আগ্রহী হয় তাহলে 'আশ্হাদু' বলতে হবে। 'শাহিদ্ভু' শব্দ বলা সহীহ্ হবে না। কেননা এরপ শব্দ সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না বরং 'শাহিদ্ভু' সাক্ষ্য কাষী বা প্রশাসকের সামনে প্রদান করতে হবে (উমদাভুল ফিক্হ, ৩য় খণ্ড)।

আকাশ মেঘাছরে না থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান

শাওয়ালের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এ অবস্থায় একদল লোক চাঁদ দেখলে শরীয়তে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। দু'-একজন লোক চাঁদ দেখার দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এ সময় একদল লোকের সাক্ষ্য প্রদান করা আবশ্যক। ফিকহ্ গ্রন্থে চাঁন প্রত্যক্ষকারীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নেই। অবশ্য এমন সংখ্যক লোককে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যাতে এ ব্যাপারে কারো কোনরূপ দ্বিধা, সংশয় না থাকে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অবশ্য দু'-একজন লোক চাঁদ দেখার সক্ষ্য দান করলে ইমাম তা প্রত্যাখ্যন না করে আরো গোকের সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা এর অপেক্ষায় থাকবেন। এভাবে আরো লোকের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে ইমাম চাঁদ দেখার ও ঈদ উদ্যাপন করার ফয়সালা প্রদান করবেন (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ঈদুল আযহা ও অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বিধান

ঈদুল আযহার চাঁদ অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের চাঁদ এবং বছরের অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বিধান ঈদুল ফিত্রের চাঁদ দেখার বিধানের মতই। এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত। তাই মুসলমান আযাদ এবং অপবাদে দণ্ডপ্রাপ্ত নয় এরূপ দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করলে প্রশাসক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেনে।

সাক্ষ্য দতোদের আদিল হতে হবে। এবং 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি' বলে তাদের সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। আকাশে চাঁদ দেখার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে উপরোক্ত বিধান কার্যকর হবে। আর যদি চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে অন্য সকল মাসের মত এ মাসগুলোতেও একদল মানুষের চাঁদ দেখার দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কিরাম আকাশে প্রতিবন্ধকতা না থাকা অবস্থাতেও রমযান ও দুই ঈদের ব্যতীত অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা এ সকল মাসে চাঁদ দেখার প্রতি সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে আগ্রহ খুবই কম। ফলে খুব কম সংখ্যক লোকই এ মাসগুলোর চাঁদ অনুসন্ধান করে বা প্রত্যক্ষ করে। অতএব দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা চাঁদ দেখলে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

কারো চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের প্রত্যয়নে সাক্ষ্য প্রদান

কেউ চাঁদ নেখার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, এই মর্মে কায়ীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করা হলে কায়ী তা গ্রহণ করবেন এবং সেই হিসাবে নির্দেশ জারি করবেন। এ ক্ষেত্রে মূল সাক্ষীর সমসংখ্যক সাক্ষী উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলেই তা গৃহীত হবে। রমযানের চাঁদ যেহেতু একজন বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাই প্রমাণিত হয় তাই চাঁদ প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীর সত্যায়নকারীও কেবল একজন আদিল ব্যক্তি হলেই তা গৃহীত হবে।

রমযানের চাঁদ ব্যতীত অন্য সকল মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে কমপক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। তাই চাঁদ প্রত্যক্ষকারীর সাক্ষ্যে সত্যায়নকারীও দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হতে হবে। তখন সত্যায়নকারীদের সাক্ষ্য প্রদানের যাবতীয় শর্তও বহাল থাকতে হবে।

দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা নিজ এলাকার কাষীর নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, অমুক শহরের দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সে এলাকার কাষীর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করছে এবং তিনি তা গ্রহণ করে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার রায় প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় সেই কাষীর রায় প্রদান এই কাষীর জন্য দলিল বিধায় তিনি এই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। এবং সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান করবেন।

কিন্তু কোন কাষীর চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা সম্পর্কে অন্য কাষীকে খবর অবহিত করা হলে ঐ কাষী ঐ খবরের উপর ভিত্তি করে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার কারণ তা নিছক সংবাদ যথা নিয়মে সাক্ষ্য প্রদানের সত্যায়ন সাক্ষ্য নয়। অতএব যদি একদল লোক এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, অমুক এলাকার লোকেরা এই এলাকার লোকজনের একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছে সে হিসাবে তাদের আজ ত্রিশতম দিন, তাহলে তাদের কথায় এ এলাকার লোকদের পরবর্তী দিন রোযা না রেখে ঈদ করা সহীহ হবে না। কেননা, তারা নিছক সংবাদ দিয়েছে; কোন সাক্ষ্য প্রদান করেনি। কাজেই এই এলাকার লোকেরা পরের দিন রোযা রাখবে এবং তারাবীহ্ ন্যমায়ও পড়বে (উমানাতুল ফিকহ, ৩য় খণ্ড)

অনুরূপ কিছু লোক এসে যদি নিজ এলাকার কাষীর নিকট এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, অমুক এলাকার কাষী সে এলাকায় লোকদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে শাওয়ালের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা করেছেন, তাহলেও এ কাষী ঐ খবরের উপর ভিত্তি করে শাওয়ালের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা করতে পারবেন না। কারণ এটাও নিছক খবর, সাক্ষ্য নয়।

রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরই যথেষ্ট। সাক্ষ্য প্রদান অপরিহার্য নয়। কিন্তু ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য নিছক খবর যথেষ্ট নয়। যথা নিয়মে সাক্ষ্য প্রদানও অপরিহার্য। সুতরাং দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা 'স্ক্লয় দিচ্ছি' বলে চাঁদ প্রত্যক্ষ করার বর্ণনা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

সরকার কর্তৃক যথানিয়মে গঠিত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য চাঁদ দেখা কমিটির নিকট যথা নিয়মে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করলে এতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির ফয়সালা কার্যকর হবে বলে বিবেচিত হবে। যে গ্রাম বা এলাকায় চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তি যদি রমযানের চাঁদ দেখে তবে তার জন্য অপরিহার্য যে, সে এলাকার মসজিদে গিয়ে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করবে । যথানিয়মে সাক্ষ্য গ্রহণের পর চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে এবং উক্ত এলাকার সকলের জন্য রোযা রাখা অপরিহার্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হলে

কোন প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবৃদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান যদি একাকী রম্যানের চাঁদ দেখে, কিন্তু ইমাম বা কাষী বা সংশ্রিষ্ট কর্তৃপক্ষ শর্মী দলিলের ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য মনে না করেন তাহলে চাঁদ প্রমাণিত হবে না, তবে এ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। শর্মী দলীল দ্বারা এ ক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় তার একা চাঁদ দেখা অথবা আকাশে মেঘ কুয়াশা ইত্যাদি থাকা অবস্থায় চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির ফাসিক হওয়া ইত্যাকার অনির্ভরযোগ্য অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

চাঁদ প্রত্যক্ষকারীর সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়ার অন্য সকলের নিকট পরবর্তী দিন শা বানের ত্রিশ তারিখ এবং তার নিজের নিকট তা রমযানের প্রথম দিন বলে গণ্য হবে। অধিকাংশ আলিমের মতে তার জন্য এদিন রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি সে এ রোযা ভেঙে ফেলে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কিন্তু এমন ব্যক্তির রোযা ত্রিশটি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও সে একাকী রোযা তরক করতে পারবে না বরং ইমাম ও অন্য সকলের সাথেই তাকে ঈদ করতে হবে। (আলমগীরী, ১ম ২৪)।

এতে তাকে একত্রিশটি রোযা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার একটি রোযা নফল বলে গণ্য হবে বাকি ত্রিশটি রমযানের ফর্য রোযা হবে। সে যদি ত্রিশ দিনের প্রবর্তী দিনটিতে রোযা না রাখে তবে কাযা ওয়াজিব হবে। এই বিধান ফাসিক, আদিল উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

একা চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি যদি কাষী বা ইমামের নিকট সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বেই তার রোষা ভেঙে ফেলে, তাহলে সহীহ্ মত হচ্ছে এই যে, তাকে ওধু কাষা আদায় করতে হবে, কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

অনুরূপ একা চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি কাষী বা ইমামের নিকট সাক্ষ্য প্রদান না করে সে ক্ষেত্রে তার উপর রোষা রাখা ওয়াজিব। যদি রোষা না রাখে তাহলে শুধু কাষা ওয়াজিব হবে।

কাষী যথন কারো সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন, তখন তার জন্য তারাবীহের নামায পড়া জরুরী হয় না। কিন্তু সাক্ষ্য কবৃল করলে যেহেতু সকলের জন্যই তারাবীহ্ জরুরী হয় তেমনি এই ব্যক্তির জন্যও তারাবীহের নামায পড়া জরুরী হবে (উমদাতুল ফিক্হ)।

চাঁদ দেখার খবর ঘোষণা এবং এজন্য আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার

কোন ঘটনা বা লেনদেন সম্পর্কে কাউকে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে জানালে টেলিফোন করলে এবং টেলিফোনে তার আওয়াজ সুম্পষ্টভাবে বুঝা গেলে বা চিঠি লিখলে এবং পত্র লেখকের লেখার ভঙ্গি ও হস্তাক্ষর সম্পর্কে প্রাপকের পূর্ণ পরিচিতি থাকলে তার প্রেরিত ও বর্ণিত বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করাতে কোন আপত্তি থাকে না। ফলে যাকে সংবাদ জানানো হয়, তার এ সংবাদে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা তার জন্য বিধিসমত বলে বিবেচিত হয়। দুনিয়ার অধিকাংশ লেনদেন এভাবেই হয়ে থাকে।

কিন্তু কারো বিশ্বাস্য সংবাদকে সর্বজন গ্রহণীয় করতে হলে এবং এই সংবাদ অনুসারে আমল করানোর ইচ্ছা পোষণ করলে এতে সাক্ষ্য প্রদানের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। নতুবা তা ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না । কাজেই সাদ দেখার বিষয়ে এবং অন্যান্য শর্য়ী বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য প্রশাসক বা নেতৃস্থানীয় আলিম ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য। তা না হলে প্রেরিত সংবাদ যতই বিশ্বাস্যোগ্য হোক, তা ফয়সালার মানদণ্ডে বিবেচিত হবে না ।

চাঁদ দেখা কর্তৃপক্ষ যদি সাক্ষ্য প্রদানে এই বিধান অনুসরণ করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পর তা গ্রহণ করে সরকার কর্তৃক প্রচার করার জন্য শর্ত হলো, এ বিষয়টি নিম্নোক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার কোন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে ঃ

- ১. غلى الرُّؤية চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান,
- ২. عَلَى الرُّوْيَة काँप एखात लाका अप्तरतत পरक लाका अपान,
- ৩. شَهَادَة عَلَى الْقَضَا আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক চাঁদের ফয়সালা প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান ।

চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান

শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নির্ভরযোগ্য এক বা একাধিক আলিমের উপস্থিতিতে চাঁদ দেখার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করা।

চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান

যদি চাঁদ প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি নিজে আলিমদের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে না পারে, তাহলে প্রতি একজনের সপক্ষে দুইজন করে সাক্ষ্যী নির্ধারণ করবে। তারা আলিমগণের নিকট গিয়ে বলবেন যে, অমুক আমাদের নিকট সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে যে, আমি অমুক রাতে অমুক স্থানে সচক্ষে চাঁদ নেখেছি। আর আমি সাক্ষ্য দিছি যে, সে তার সাক্ষ্য প্রদানে আমাকে সাক্ষ্যী নির্ধারণ করেছে। তাই আমি তার পক্ষে নাক্ষ্য প্রদান করছি।

আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক চাঁদের ফয়সালা প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান

যেখানে চাঁদ দেখা গিয়েছে, যদি সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে কোন স্থানীয় 'চাঁদ দেখা কমিটি' থাকে এবং সে কমিটিতে এমন নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরাম থাকেন যাঁদের ফাত্ওয়ার প্রতি স্থানীয় আলিমগণ ও স্থানীয় জনগণ পূর্ণ আস্থা রাখেন, চাঁদ প্রত্যক্ষকারীরা তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাদের চাঁদ প্রত্যক্ষ করার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং উক্ত উলামায়ে কিরাম তাদের সাক্ষ্য কবৃল করেন, তাহলে তাদের উক্ত এলাকার জন্য উলামায়ে কিরামের এই রায় প্রদান যথায়েও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বত্র তাদের রায় কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্রের 'কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটি'র সামনে উক্ত উলামায়ে কিরামের রায় নিম্নোক্ত শর্তাবলীসহ উপস্থাপন করতে হবে ঃ

উক্ত আলিমগণ সকলে বা সকলের পক্ষ হতে একজন পত্র মারফত জানাবেন যে, অমুক সময় আমাদের উপস্থিতিতে আমাদের নিকট দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং আমাদের নিকট তাদের এই সাক্ষ্য প্রদান নির্ভরযোগ্য ও যথাযথ বলে প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষিতে আমরা চাঁদ ওঠার রায় প্রদান করেছি। দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে চিঠিটি লিখে বন্ধ করে তাদের হাতে 'কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটি'র নিকট তা পাঠাতে হবে। তারা চিঠিটি হস্তান্তরের সময়ও এই সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, অমুক আলিমগণ আমাদের উপস্থিতিতে চিঠিটি লিখে বন্ধ করে আমাদের হাতে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটির নিকট শরীয়তের শর্ত মুতাবিক এই পত্র গৃহীত বলে বিবেচিত হওয়ার পর তাঁরা সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে সারাদেশে চাঁদ দেখার রায় প্রদান করবেন। তালের এই রায় সারা দেশের সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য গ্রহণীয় হবে। সে ক্ষেত্রেও সাধারণ সংবাদ পাঠকের মাধ্যমে তা জানানো যথেষ্ট হবে না। বরং কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটির পক্ষ হতে একজন নেতৃস্থানীয় আলিম স্বয়ং রেডিও বা টেলিভিশন মারফত দেশবাসীকে সাক্ষ্য প্রদানের তিনটি অবস্থার যেটি এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে তার উল্লেখ করে জানাবেন যে, উক্ত পন্থায় আমাদের নিকট চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে আমরা সর্বসম্বতিক্রমে চাঁদ ওঠার রায় প্রদান করছি এবং সরকারের পক্ষ হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে আমরা তা সারাদেশে প্রচার করছি।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি সহজ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ঃ

সরকার চাঁদ সম্পর্কিত মাসআলা মাসাইলে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কির্মুম নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি চাঁদ দেখা কমিটি গঠন করবেন অনুরূপ দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও আঞ্চলিক চাঁদ দেখা কমিটি গঠন করবেন। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক কমিটি সমূহকে চাঁদ দেখার যথারীতি সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। আঞ্চলিক কমিটি যথা নিয়মে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এরপর এই সংবাদ আঞ্চলিক কমিটি টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চাঁদ দেখা কমিটির নিকট এমনভাবে পৌছাবেন যেন তার মধ্যে কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটি দেশব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এরপ ক্ষেত্রে রেডিও ও টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত ঐ সংবাদ যথায়থ বলে গৃহীত হবে (জাওয়াহিক্সল ফিকহ)।

ইখৃতিলাফে মাতালি'-এর হকুম

ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশে চন্দ্র উদয়ের সময়েও পার্থক্য হয়ে থাকে। একেই 'ইখতিলাফে মাতালি' বলা হয়। এ অবস্থায় কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্বের লোকদের রোযা ও ঈদ ইত্যাদির ব্যাপারে তা গৃহীত হবে কিনা এ নিয়ে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছু মতভেদ ছিল।

একদল ফিকহবিদের বর্ণনায় রয়েছে যে, বিশ্বের কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে রমযানের রোযা ও ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে তা সর্বত্রই গ্রহণীয় হবে। এমনকি তাঁদের মতে প্রাচ্যের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা পাশ্চাতের জন্য প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ পাশ্চাত্যের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা প্রাচ্যের জন্য প্রযোজ্য হবে। যাহেরী রিওয়ায়াতে এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী ফকীহ্গণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোন এক দেশে চাঁদ দেখা গেলেও তার নিকটবর্তী দেশের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। দূরবর্তী দেশের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না।

মুতা'আখ্খিরীন ফকীহ্গণ যাহেরী রিওয়ায়েতের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, 'ইখতিলাফে মাতালি' গ্রহণযোগ্য নয়।

মৃতাকাদিমীন উলামায়ে কিরামের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলে এই যে, ইথতিলাফে মাতালি নিকটবর্তী দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। দূরবর্তী দেশসমূহ যেখানে চাঁদের উদয়ে এক দিনেরও পার্থক্য হয়ে থাকে সেখানে ইথতিলাফে মাতালি মৃতাবার হবে। মুহাক্লিক আলিমগণ এ মতের উপর ইজ্মা' একমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন (বাদায়েউস্ সানায়ে ও তাবসনুল হাকাইক, যায়লায়ী, বিদায়তুল মুজাতাহিদ, মা'আরিফুস্ সুনান)।

সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা রাখা ও ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গে

কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা বিশ্বে একইদিন রোযা আরম্ভ এবং একই দিনে ঈদ উদ্যাপন করা আবশ্যক। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া ঃ

ক. সাহাবা কিরাম, তাবিঈন, তাবি-তাবিঈনের যমানায় মুসলিম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিন রোযা পালন ও ঈদ পালন করা হয়েছে। ঐ যমানায় একই দিনে রোযা পালন বা ঈদ উদ্যাপনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। যদি একই দিনে ঈদ ও রোযা পালনের শরীয়তী কোন নির্দেশ থাকত তবে অবশ্যই তারা তা পালনের ব্যবস্থা করতেন।

থ. একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করতে হলে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে চন্দ্রের উদয়স্থলের মানদগুরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ শরীয়তে কোন স্থানকে এরপ মানদণ্ড সাব্যস্ত করে নাই। আর শরীয়তের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে কোন স্থানকে মানদণ্ডরূপে ঘোষণা করা হলে তাতে উত্মাতের মধ্যে আরো অধিক ইখতিলাফ ও অনৈক্য সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

গ. বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ উদ্যাপন করতে গেলে ঃ

"তোমরা চাঁদ দেখে রোয়া রেখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ করো।" এই হাদীসের উপর সকল এলাকার লোকের আমল করা সম্ভব নয়। তথন চাঁদ দেখা সত্ত্বেও বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলের লোক রোয়া ও ঈদ পালন করতে পারবে না এবং চাঁদ না দেখেও কোন কোন অঞ্চলের লোকদের (একই দিনে রোয়া ও ঈদ করার স্বার্থে) রোয়া ও ঈদ পালন করতে হবে। অথচ তা যেমন বাস্তবসম্মত নয় তেমন হাদীসেরও পরিপন্থী।

অমুসলিম দেশ থেকে প্রাপ্ত চাঁদ দেখার খবর

যেহেতু অমুসলিম দেশে ইমাম বা কাষী নেই, তাই মুসলিম বিচারক থাকলে তার নিকট চাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। যদি মুসলিম বিচারক না থাকেন বা তিনি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা না করেন তাহলে স্থানীয় বিশিষ্ট আলিমের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করবে। যদি এলাকায় কোন বিশিষ্ট আলিমও না থাকেন, তাহলে স্থানীয় মসজিদে সবার সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করবে। এভাবে চাঁদ দেখা

স্বীকৃত হওয়ার পর তা ঐ দেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশসমূহে তা গ্রহণীয় হবে না। কারণ অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিসালিত সংবাদ মাধ্যমে প্রাপ্ত ববর শর্য়ী ব্যাপারে গ্রহণ করা যায় না।

জ্যোতির্বিদ ও আবহাওয়াবিদদের হিসাবে চন্দ্রোদয় নির্ণয়

শরীয়তের দৃষ্টিতে জ্যোতির্বিদ ও আবহাওয়াবিদদের কথা অনুযায়ী রোষা রাখা বা না রাখা কোনটিই সাব্যস্ত হবে না। রোষা, ঈদ ইত্যাদি সাব্যস্ত হবে চাঁদ প্রত্যক্ষ করার দ্বারা এ বিষয়ে আলিমগণ একমত। কেননা নবী করীম (সা) ইরশান করেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোষা রাখো এবং চাঁদ দেখে ঈদুল ফিত্র কর, আর যদি রমষানের চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শা বানের ত্রিশদিন পূর্ণ করো।

বিভিন্ন দেশে সফর করার ফলে রোযা ত্রিশ দিনের অধিক বা উনত্রিশ দিনের কম হওয়া প্রসঙ্গে

রমযানের মধ্যে কেউ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার পর সে দেশে রমযান মাস চলতে থাকলে বা রমযান মাস শেষ হলে সে দেশবাসীর ন্যায় তাকে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার রোযা ত্রিশদিনের অধিক হলেও সে দেশবাসীর অনুসরণে তাকে রোযা রাখতে হবে। যে ত্রিশ দিনের অধিক সে রোযা রেখেছে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি উনত্রিশ দিনের কম হয় তবে সে দেশবাসীর অনুসরণে তাদের সাথে ঈদ পালন করবে। পরে উক্ত রোযার কাযা করে নিবে (আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)।

যেখানে চাঁদ কখনো দেখা যায় না সেখানে রোযার হকুম

যে জায়গায় সদাসর্বদা মেঘ অথবা অন্য কোন কারণে কথনো চাঁদ দেখা সম্ভব হয় না, সেখানে নিকটবর্তী যে রাষ্ট্রের শরীয়তের নিয়মাবলী মেনে চাঁদের ফয়সালা প্রদান করা হয় সে রাষ্ট্রের ফয়সালা নিজ দেশের জন্যও প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হবে :

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহ্রী ও ইফ্তার

সাহ্রীর ফ্রবীলত

'সাহ্রী' শব্দটি আরবী 'সাহরূন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যা পানাহার করা হয় তাকে 'সাহ্রী' বলা হয়।

হাদীস শরীফে সাহ্রী খাওয়ার অনেক ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুক্সাহ (সা) বলেছেন ঃ তিনটি কাজে বরকত রয়েছে। মুসলমানদের জামা'আতে, সারীদ নামক খাদ্যে ও সাহ্রীতে তাবানী নামক খাদ্যে। সাহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব।

সাহ্রী খাওয়াতে বহু বরকত রয়েছে। কারণ এর দ্বারা রোযা রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মন প্রফুল্প থাকে। এগুলো হলো সাহ্রী খাওয়ার বাহ্যিক বরকত। এ অন্তর্নিহিত বরকত এই যে, ঐ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। এটা দু'আ কবৃলের সময়। এ সময়কার দু'আ, যিক্র, ইবাদত ও ইসতিগফার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয় (নব্বী শরহে মুসলিম)।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্রী খাও। কেননা সাহ্রীতে বরকত রয়েছে (মুসলিম)।

হযরত আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুরাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও আহলে কিতাব-এর (ইয়াহ্দী ও নাসারাদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো, সাহ্রী খাওয়া (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) বলেন, রম্যান মাসের কোন এক রাতে রাসূল্লাহ (সা) আমাকে সাহ্রী থেতে ডাকলেন এবং বললেন ঃ এসো মুবারক খানার দিকে (মিশকাত)।

'বাহরুর রায়িক' কিতাবে উল্লেখিত এক হাদীসে রয়েছে নবী করীম (সা) বলেনঃ সাহ্রী খাওয়ার সব কাজেই বরকত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ করো না।

সাহ্রীর সময় ও আদাব

সাহ্রী খাওয়ার মুত্তাহাব। এর জন্য উপযুক্ত সময় হলো রাতের শেষ ভাগ।

ফকীহ্ আবুল লাইস সমরকান্দী (র) বলেন, সাহ্রীর জন্য উপযুক্ত সময় হলো রাতের ষষ্ঠাংশ। অর্থাৎ সূর্যান্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কয় ঘন্টা হয় তার হয় ভাগের শেষ ভাগ (আলমগীরী, ১ম ২ও)। বিলম্বে সাহ্রী গ্রহণ করা মুস্তাহাব। তবে সুব্হে সাদিক হয়ে যাওয়া এবং রোযায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশস্কা দেখা দেওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরহ। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সাহ্রী খাওয়া জায়েয। এরপরে জায়েয নেই (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

সাহ্রীর আদবসমূহের অন্যতম হচ্ছে হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাদ্য পরহেয় করা। অতি ভোজন থেকে বিরত থাকাও সাহ্রীর আর একটি আদব। অর্থাৎ পরিমিত আহার করবে। এ পরিমাণ আহার করবে না যাতে কষ্ট হয় ও ঢেকুর ওঠে।

সাহ্রীর জন্য খাদ্য গ্রহণ সম্ভব না হলে অন্তত এক গ্লাস পানি হলেও পান করে নিবে। এতে সাহরীর বরকত ও সাওয়াব লাভ হবে।

সাহ্রী সম্পর্কিত মাসাইল

এই ধারণায় যদি সাহ্রী গ্রহণ করে যে, সূব্হে সাদিক হয়নি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূব্হে সাদিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্**ফারা** ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যদি কেউ এই ধারণায় স্ত্রী সহবাস করে যে, রাত অবশিষ্ট আছে, কিন্তু পরে জানতে পারল হে, সুবহে সাদিকের পর সহবাস করা হয়েছে এবং জানার সঙ্গে সঙ্গে সে বিরত হলো, এ অবস্থায় তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যেহেতু তার এ ভুল হিল অনিচ্ছাকৃত (শামী, ২য় খণ্ড)।

সুবহে সাদিকের ব্যাপারে সন্দেহ হলে সাহ্রী গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উত্তম। অবশ্য সন্দেহ সত্ত্বেও পানাহার করলে রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে যদি সুবহে সাদিক হওয়ার পরে পানাহার করা হয়েছে বলে সুনিচিত হয় অথবা এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় নেক্ষেত্রে তার প্রতি রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

দু'জন সাক্ষ্য দিল যে, সুব্হে সাদিক হয়েছে। আর দু'জন সাক্ষ্য দিল যে উদয় হয়নি। সে অবস্থায় পানাহার করল এরপর প্রকাশ পেল যে, সত্যিই সুব্হে সাদিক হয়েছিল। তাহলে তার উপর কাযা, কাফ্ফারা দু'টোই ওয়াজিব হবে।

যদি এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সুব্বে সাদিক হয়ে গেছে এবং হ্ন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে হয়নি এ অবস্থায় পানাহার করার পর জানা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে তখন সুব্বে সাদিক হয়ে গিয়েছিল তবে তার রোযা কায়া করতে হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন লোক সাহ্রী গ্রহণ কালীন সময়ে একনল লোক তার কাছে এসে বলল, সুব্বে সাদিক উদয় হয়েছে। এখন সাহ্রী গ্রহণকারী ভাবল রোযা যখন নষ্ট হয়ে গেছে তাই খেয়ে নিই এবং তাই করল। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে, প্রথমবার খাদ্য গ্রহণ মূলত সুব্হে সাদিকের পূর্বে ছিল কিন্তু পরবর্তী খাদ্য গ্রহণ হয়েছে সুবৃহে সাদিক উদয়ের পর। এ সম্পর্কে ইমাম মুহামদ (র) বলেন, যদি আগন্তুকরা একদল হয় আর তাদেরকে সত্য মনে করে থাকে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি আগন্তুক মাত্র এক ব্যক্তি হয় চাই সে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হোক কিংবা না হোক, তার কথার উপর নির্ভর করে উপরোক্তভাবে আহার গ্রহণ করে থাকলে তার উপর কার্যা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কোন ব্যক্তি তার দ্রীকে বলল, ভাল করে দেখে এস সুব্হে সাদিক উদয় হয়েছে কিনা। দ্রী আকাশের দিকে তাকাল। ফিরে এসে বলল, সুব্হে সাদিক উদয় হয়নি। তথন স্বামী তার সাথে সহবাস করল। কিন্তু পরে জানতে পারল যে, তথন সুব্হে সাদিক উদয় হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে কোন কোন ফ্রীহ্ বলেন, দ্রী নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক উভয় অবস্থায়ই স্বামীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না আর স্ত্রী যদি সুব্হে সাদিক হয়েছে জেনে এই কাজ করে থাকে তবে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব।

সাহ্রী গ্রহণ করার সময় সুব্হে সাদিক উদয় সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেনি যে, সুব্হে সাদিক উদয় হয়েছিল কিনা ? এ অবস্থায় তার উপর কাযা কাফ্ফারা কোনটিই ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

সুব্হে সাদিক হয়ে গিয়েছে এরপ ধারণা হওয়া সত্ত্বেও কেউ সাহ্রী গ্রহণ করন। পরে পরে জানা গেল যে, তখন সুব্হে সাদিক হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তার ঐরোযা শুদ্ধ হবে না। পরে তার কাযা করতে হবে। আর যদি তখন সুব্হে সাদিক হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে এক্ষেত্রে তার উপর কাযা কাফ্ফারা কোনটাই ওয়াজিব নয়।

কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, এক্ষেত্রে কাযা করে নেওয়া ভাল। যথন কোন ব্যক্তি সাহ্রী গ্রহণ করল এ ধারণায় যে, রাত অবশিষ্ট আছে। পরে জানতে পারল যে, তথন সূব্বে সাদিক হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

সূব্হে সাদিক হয়েছে বলে প্রবল ধারণা হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ সাহ্রী গ্রহণ করে তবে তার উপর কাষা ওয়াজিব হবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

সূব্হে সাদিক হয়ে যাওয়ার কথা জানার পর সাহরী খাওয়া নিষেধ। তাই সূব্হে সাদিকের পর কেউ সাহরী খেলে তার রোযা শুদ্ধ হবে না। সাহরী খাওয়া অবস্থায় সূব্হে সাদিক হয়ে গেলে সাথে সাথে খানা বন্ধ করে দিতে হবে। এ অবস্থায় মুখে কোন খাদ্য থাকলে তাও গিলে ফেলা জায়েয় হবে না।

কেউ যদি নিজে বা অন্য কারো মাধ্যমে সুব্হে সাদিক নিরূপণ করতে সক্ষম না হয় তবে সে তাহারীর তথা চিন্তা-ভাবনা করে প্রবল ধারণা অনুসারে আহার গ্রহণ করবে। রমযান মাসে নির্ধারিত সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সাইরেন, ঘণ্টা বা মাইক ইত্যাদির মাধ্যমে সাহ্রী বা ইফতারের যে সময় ঘোষণা করা হয় এর ভিত্তিতে সাহ্রী ও ইফতার গ্রহণ করা জায়েয। ভুলবশত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সাহ্রী বা ইফ্তারের সময় প্রচার করা হলে তার উপর নির্ভর করে সাহ্রী বা ইফ্তার গ্রহণ করা জায়েয হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

ইফ্তারের ফ্যীলত

'ইফ্তার' শব্দের আভিধানিক অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। শরীয়তের পরিভাষায় রোযাদার ব্যক্তি সূর্যান্তের পর যে পানাহার করে তাকে 'ইফ্তার' বলা হয়। হাদীস শরীফে ইফ্তারের বহু ফথীলত ও বরকতের কথা বর্ণিত রয়েছে।

যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصَّائم فرحتان فرحة عند فطرة وفرحة عند لِقَاء ربَّه ـ

হযরত আবৃ হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, রোযাদার ব্যক্তির জন্য দু'টি আনল। একটি তার ইফ্তারের সময় অন্যটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময় (বুখারী ও মুসলিম)।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة لا ترد دعوتهم الصّائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم ـ

হযরত আবৃ হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, তিন ব্যক্তি যাদের দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। রোযাদার যখন ইফ্তার করে, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং মজলুমের দু'আ।

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصَّائم عند فطرة لدعوة ما ترد ـ

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রোযাদার ব্যক্তির ইফ্তারের সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না (আত্তারগীব ওয়াত তারহীব)

সালমান ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যথন তোম দের কেউ ইফ্তার করে যেন থেজুর দারা ইফ্তার করে। কেননা এতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায় তবে সে যেন পানি দারা ইফ্তার করে। কেননা পানি পবিত্রকারী (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবৃ দাউদ, ইব্ন মাজা ও দারেমী)।

ইফ্তারের সময়

সূর্যান্তের পর সাথে সাথে ইফ্তার করা সুনাত। যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, সূর্যান্ত হয়ে গিয়েছে তখনই ইফ্তার করতে হবে। সূর্যান্তের পর মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বেই ইফ্তার করা মুস্তাহাব (আলমগীরী)।

হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন রাত আসবে দিন চলে যাবে, তখন রোযাদারগণ ইফ্তার করবে (মুসলিম)।

ইফ্তারের আদাব

থেজুর দ্বারা ইফ্তার করা মুন্তাহাব। থেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। সূর্যান্তের পূর্বে ইফ্তার সামনে নিয়ে বসে সূর্যান্তের জন্য অপেক্ষা করা মুন্তাহাব। তাতে অল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন।

ইফ্তারের দু'আ

ইফ্তারের সময় দু'আ কবৃল হওয়ার একটি বিশেষ মুহূর্ত। হাদীস শরীফে ঐ সময় দু'আ করার ব্যাপারে বিশেষ ফ্যীলত বর্ণিত রয়েছে। ইফ্তার প্রসঙ্গে হাদীসে বিভিন্ন দু'আ বর্ণিত রয়েছে। রাস্লুল্লাহ্ (সা) এ দু'আ পড়তেন ঃ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিকে রোযা খুলছি (আবৃ দাউদ)

ইফ্তার করানোর ফ্যীলত

রোযাদারকে ইফ্ভার করানোর মধ্যেও বিশেষ সাওয়াব রয়েছে। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্ভার করাবে অথবা কোন মুজাহিদকে জিহাদের আসবাব প্রদান করবে সে রোযা ও জিহাদের অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্ভার করাবে তা তার জন্য গুনাহ মাফের ও জাহান্নামের আগুন হতে নাজাতের কারণ হবে এবং সে ঐ রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। এতে রোযাদারের সাওয়াব বিশুমাত্র কম হবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাস্লাল্লাহ্! আমাদের প্রত্যেকেরই তো রোযাদারকে ইফ্ভার করানোর সামর্থ্য নেই। তখন রাস্লুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ (পেট ভর্তি করে খাওয়ান জরুরী নয়) যে ব্যক্তি রোযাদারকে একটোক দুধের শরবত অথবা একটি খেজুর বা একটু পানি দারা ইফ্ভার করাবে তাকেও আল্লাহ্ তা আলা এই সাওয়াব দান করবেন (বায়হাকী)।

ইফতার সম্পর্কিড মাসাইল

কোন রোযাদার যদি এই ধারণায় ইফ্তার করে যে. সূর্যান্ত হয়েছে। অথচ তখন সূর্যান্ত হয়নি। তাহলে তার উপর কাষা গুয়াজিব হবে, কাফ্ফারা গুয়াজিব হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফ্তার করে অতঃপর জানতে পারে যে, সূর্য ডুবেনি। সূর্যান্তের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে ঐ রোযার কাষা করে নিবে (মুয়ান্তা ইমাম মুহাম্মদ ঃ সাওম অধ্যায়)।

সূর্যান্ত সম্পর্কে সন্দেহ থাকাবস্থায় ইফ্তার করা জায়িয নয়। কেউ সে অবস্থায় ইফ্তার করলে এবং পরবর্তী সময়ে সূর্যান্ত সম্পর্কে কিছু জানতে না পারলে তার উপর ঐ রোযার অবশ্যই কাযা ওয়াজিব হবে। ফকীহু আবু জাফরের বরাত দিয়ে 'ফাতহুল কাদীরে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। আর যদি পরবর্তী সময়ে সূর্যান্ত না হওয়া জানা যায় তাহলে তার উপর কাযা কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। আর যদি পরবর্তী সময়ে জানা যায় যে, ঐ সময় সূর্যান্ত হয়ে গিয়েছিল তাহলে তার উপর কাযা, কাফ্ফারা কিছুই ওয়াজিব হবে না (তাতার থানিয়াহ ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

দু'জন সাক্ষ্য দিল যে, সূর্যান্ত হয়ে গিয়েছে আর একজন সাক্ষ্য দিল যে, সূর্যান্ত হয়নি। ঐ অবস্থায় ইফ্তার করার পর পরবর্তীতে জানা গেল যে, সূর্যান্ত হয়নি সেক্ষেত্রে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। (তাতার খানিয়াহ)।

ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইফ্তার করা

সূর্যান্তের পর বিলম্ব না করে সাথে সাথে ইফ্তার করা উত্তম। মাগরিবের নামাযের আগে ইফ্তার করা মুস্তাহাব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেন ঃ মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতদিন সূর্যান্তের পর বিলম্ব না করে ইফ্তার করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনটি বিষয় নবীগণের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ঃ

- ১. শীঘ্র ইফ্তার করা,
- ২. বিলমে সাহ্রী গ্রহণ করা,
- ৩. মিসওয়াক করা (শামী, ২য় খণ্ড)।

তবে মেঘাছ্ট্রে দিনে সূর্য ভূবে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে ইফ্তার করবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

বিলম্বে ইফ্তার করা

বিলম্বে ইফ্তার করা মাকরহ অর্থাৎ নক্ষত্রের আলো বিচ্ছুরিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে ইফ্তার করা মাকরহ। তবে মেঘাচ্ছনু দিনে শীঘ্র ইফ্তার করা মুন্তাহাব নয়। এ রকম দিনে যখন পূর্ণ বিশ্বাস হবে যে, সূর্য ডুবেছে তখনই ইফ্তার করবে। এর পূর্বে ইফ্তার করবে না। এমনকি সময়ের পূর্বে আযানের শব্দ তনা গেলেও ইফ্তার করবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ই'তিকাফ

ই'তিকাফের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও স্থান

ই'তিকাফ-এর শাদিক অর্থ অবস্থান করা, কোন বস্তুর ওপর স্থায়িভাবে থাকা। ই'তিকাফের মধ্যে নিজের সন্তাকে আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয় এবং নিজেকে মসজিদ হতে বের হওয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় ই'তিকাফের নিয়তে পুরুষের ঐ মসজিদে অবস্থান করা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা হয় অথবা কোন মহিলার নিজ ঘরে নামাযের স্থানে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার সবরকম ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিন্তে একমাত্র তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা।

যে মসজিদে নিয়মিতভাবে আয়ান, ইকামতসহকারে জামা আতের সাথে নামাহ আদায় হয় সেই মসজিদেই ই'তিকাফ করা সহীত্ হবে। ই'তিকাফের সর্বোত্তম স্থান মসজিদুল হারাম, এরপর মসজিদে নববী (সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরপর মসজিদে আক্সা। এরপর ঐ জুমু'আর মসজিদ, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়। এরপর সে মসজিদ যেখানে মুসল্লীর সংখ্যা অধিক হয়ে থাকে (শামী, ২য় বও ও আলমগীরী, ১ম বও)।

ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, ই'তিকাফ সহীহ্ হবে এমন মসজিদে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায় করা হয় (হিদায়া, ১ম খণ্ড)।

ইমাম জালালুদ্দীন যায়লাঈ (র) 'কেফায়া' গ্রন্থে হিদায়া কিতাবে উল্লিখিত কথাটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র)-এর বক্তব্যে জুমু'আর মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদের কথা বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ যেখানে জুমু'আর নামায আদায় করা হয় সেখানে অবশ্যই ই'তিকাফ সহীহ্ হয় (ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড)।

মহিলাগণ নিজ ঘরে নামাযের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ই'তিকাফ করবেন। নামাযের জন্য জায়গা নির্ধারিত না থাকলে ই'তিকাফে বসার সময় তা নির্ধারিত করে নিলেও সহীহ্ হবে। মসজিদে ইতিকাফ করা তাদের জন্য মাকরুহ (শামী, ২য় খণ্ড)। মানতের ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। সুতরাং মানতের ই'তিকাফ কমপক্ষে একদিন করতে হবে। কেননা একদিনের কম সময়ে রোযা সহীহ্ হয় না। এ ছাড়া রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা সুনাতে মু'আক্কাদায়ে কিফায়া। নফল ইতিকাফের জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই এবং এর জন্য রোযা রাখাও শর্ত নয়। এ ই'তিকাফ অল্প কিছুক্ষণের জন্যও হতে পারে এমনকি মসজিদে না বসে মসজিদ অতিক্রম করার সময়ও নফল ই'তিকাফের নিয়ত করলে তা সহীহ্ হবে (তাহ্তাবী)।

ই'তিকাফের ফ্যীলত ও উপকারিতা

ই'তিকাফের ফ্রমালত ও উপকারিতা অপরিসীম। কেননা দুনিয়ার স্বরক্ম ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, নিভূতে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য ই'তিকাফ করা হয়। ই'তিকাফকারী পুরুষ ও মহিলা বহু ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। বালা ই'তিকাফ অবস্থায় আল্লাহ্ ত্র'আলার দরবারে উপস্থিত থাকে। এ জন্য আল্লাহ্র কাছে সে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমত, অনুগ্রহ ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। ই'তিকাফকারী ব্যক্তি পুরো সময় ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। আতা আল-খোরাসানী (র) বলেছেন, ই'তিকাফকারী সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজেকে আল্লাহ্র সম্মুখে সোপর্দ করে দিয়েছে এবং বলছে যে, আমি এ স্থান ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমাকে ক্ষমা করা হয়। এ জন্যও ই'তিকাফের গরুত্ব অপরিসীম যে, ই'তিকাফের মধ্যে বালা আল্লাহ্র ঘরে ইবাদতে মশগুল রাখার মাধ্যমে নিজের অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে (বাদায়েউস্ সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাক্ষের মধ্যে অন্তরকে দুনিয়াবী বিষয় থেকে মুক্ত করা হয়, নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করা হয়, আল্লাহ্র ঘরে নিজেকে আবন্ধ রাখা হয় এবং আল্লাহ্র ঘরে নিজেকে সবসময় আটকিয়ে রাখা হয়। অধিকন্তু ই'তিকাফকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র ঘরের সঙ্গে নিজেকে স্থায়িভাবে সম্পৃক্ত করে রাখে, যেন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। ই'তিকাফ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল যদি তা একনিষ্ঠতার সঙ্গে হয়ে থাকে (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর হংরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ই'তিকাফকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, সেই'তিকাফ এবং মসজিদে বদ্ধ থাকার কারণে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার নেকীর হিসাব সব ধরনের নেক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির ন্যায় জারি থাকে (ইব্ন মাজা)।

বাদা যথন ই তিকাফের নিয়তে নিজেকে মসজিদে আটকিয়ে রাখে তখন যদিও সে সালাত, যিকির ও তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে বহু সওয়াব অর্জন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু কিছু সাওয়াবের কাজ থেকেও সে বঞ্চিত হয়। সে রোগীর সেবা করতে পারে না। ইয়াতীম, বিধবা, নিঃম্ব ও সর্বম্বান্তের সহযোগিতা করতে পারে না, কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারে না, জানাযার নামাযে শরীক হতে পারে না- যেওলো থুবই পুণ্যের কাজ বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সে জন্য উল্লিখিত হাদীসে ই'তিকাফকারী ব্যক্তির জন্য এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার আমলনামায় সেইসব ইবাদতের সাওয়াবও লেখা হবে, ই'তিকাফের কারণে যে গুলো থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল।

রমযানে ই'তিকাফের ফযীলত ও গুরুতু

উদ্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযানের তৃতীয় দশক আগমন করলে সারারাত জেগে থাকতেন, নিজের পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে রাখতেন (ইবাদত বন্দেগীতে) কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং উদ্মূল মু'মিনীনগণ থেকে দূরে থাকতেন (মুসলিম)।

হ্যরত আয়েশ। (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাস্লুল্লাহ্ (সা) রমহানের তৃতীয় দশকে পরিশ্রম করতেন, যে রকম কঠোর পরিশ্রম অন্য সময়ে করতেন না (মুসলিম)।

হযরত আবৃ হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি রমযানে দশদিন ই'তিকাফ করতেন; কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেছেন, সে বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছেন। (বুখারী)।

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুক্সাহ্ (সা) রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি ই'তিকাফ করেননি, এজন্যে পরের বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছেন। (আবু দাউদ)।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুক্লাহ্ (সা) সর্বদা রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি সফর করেছিলেন সে জন্যে পরের বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছেন (ইব্ন মাজা)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাস্লুল্লাহ্ (সা) রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। বর্ণনাকারী নাফি (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আমাকে মসজিদের সেই স্থানটি দেখিয়েছেন, যেখানে রাস্লুল্লাহ্ (সা) ই'তিকাফ করেছেন (ইব্ন মাজা)।

হযরত ইব্ন উমর (রা) র সৃলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথন ই'তিকাফ করতেন, তখন তাঁর জন্য বিছানা বিছানো হতো আবৃ লুবাবা ইব্ন মুন্যির (রা)-এর তাওবার খুঁটির পাশে (ইব্ন মাজা)।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা) তুর্কী তাঁবুতে রমযানুল মুবারকের প্রথম দশদিন ই তিকাফ করেছেন। এরপর দ্বিতীয় দশ দিনও। এরপর তাঁবু থেকে মাথা বের করে বললেন, আমি এই (কাদরের) রাতের অনুসন্ধানে প্রথম দশদিন ই তিকাফ করেছি। এরপর দ্বিতীয় দশদিনও। তার স্বপ্নে একজন ফেরেশতা এসে আমাকে বললেন যে, এ রাতটি রমযানের শেষ দশকে। কাজেই যে আমার সঙ্গে ই তিকাফ করেছে, সে যেন শেষ দশদিনও ই তিকাফ করে। আমাকে এ রাতটি দেখানো হয়েছিল। এবং তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। (আমি স্বপ্নে) দেখেছি যে, এ রাতের সকালে ফজরের নামায়ে আমি পানি ও কাদমাটিতে সিজ্না করছি। তোমরা এ রাতের অনুসন্ধান করবে শেষ দশদিনের বিজ্ঞোড় রাতগুলোতে। বর্ণনাকারী

বলেন, ছাদ থেকে ঐ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, তখন মসজিদের ছান গাছের ভালা ছারা নির্মিত ছাপড়ার ন্যায় ছিল। এতে মসজিদের ছাদ থেকে পানি উপ্কিয়ে পড়েছিল। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, (রমযানের) একুশ তারিখ সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কপাল মুবারকে আমি স্থচক্ষে কানামাটির চিহ্ন দেখেছি (মিশকাত)।

ই'তিকাফের প্রকারভেদ ও হ্কুম

ই'তিকাফ তিন প্রকার ঃ ওয়াজিব ই'তিকাফ, সুনাত ই'তিকাফ ও নফল ই'তিকাফ।

ওয়াজিব ই'তিকাফ ঃ ই'তিকাফ ওয়াজিব হয় মানত করার দ্বরা মানত দুই ধরনের হতে পারে। সাধারণ মানত অথবা কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত মানত। সাধারণ মানত যেমন—কেট বলল, আমি অমুক তারিখে ই'তিকাফ করা মানত করলাম। শর্তের সাথে সম্পর্কিত মানত যেমন কেউ বলল—আমার উদ্দেশ্য পূরণ হলে আল্লাহ্র ওয়ান্তে ই'তিকাফ করব। মানতের ই'তিকাফ সহীহ্ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত। এমন কি, কেউ যদি মানত করে যে, রোযা রাখা ব্যতীত আমি একমাস ই'তিকাফ করব তবু তার ই'তিকাফ আদায়কালে রোযা রাখতে হবে। মানত সহীহ্ হওয়ার জন্য মানতের কথা মুখে উচ্চারণ করা জরুরী। মনে মনে নিয়ত করার দ্বারা মানত হয় না। এ প্রকার ই'তিকাফের হুকুম হলো, নিজের ওপর থেকে ওয়াজিব সাকিত হওয়া এবং সাওয়াব হাসিল করা (হাশিয়াতুত্ তাহ্তাবী ও বাহরুর বাইক, ২য় খণ্ড)।

সূন্ধত ই'তিকাফ ঃ রমহানের শেষ দশকের ই'তিকাফ যা সুন্নাতে মুয়াকাদা কিফায়া। মহন্নাবাসীর কোন একজন তা আদায় করলে অন্য সকলে দায়মুক্ত হবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই তরকে সুন্নাতের জন্য দায়ী হবে।

এই প্রকার ই'তিকাফের হুকুম হলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া থেকে মুক্ত হওয়া এবং সাওয়ার হাসিল করা (হাশিয়াতুত্ তাহতাবী ও বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

নফল ই'তিকাফ ঃ মানতের ই'তিকাফ এবং রমযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ ব্যতীত অন্য সময়ের ই'তিকাফ এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। নফল ই'তিকাফের জন্য রোয রাখা শর্ত নয় সময়ের ব্যাপারেও কোন সীমাবদ্ধতা নেই। দিনে বা রাতে যে পরিমাণ সময়ের জন্য ইচ্ছা নিয়ত করে ই'তিকাফ করা যাবে

ই'তিকাফের শর্তবিলী

- ১. নিয়ত করা। নিয়ত করা ব্যতীত ই'তিকাফ করলে ই'তিকাফ সহীহ্ হবে না।
- ২. পুরুষের জন্য এ রকম মসজিন হতে ইবে, ষেখানে জামা'আতের সাথে সালত আসায় করা হয়। (তবে নফল ই'তিকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে)। মহিলাগণ নিজেদের ঘরের সালাত আনায়ের স্থানে ই'তিকাফ করবে। তারা প্রয়োজন ব্যতীত এ স্থান থেকে বের হবে না।
 - ৩. রোম রাখা, তবে নফল ই'তিকাফের জন্য রেখা রাখা শর্ত নয়।

- ৪. মুদ্রলমান ২ওয়া, কেননা কোন অমুদ্রলিম ব্যক্তি ইবাদতের যোগ্যতা রাখে না।
- ৫. অকিল-জ্ঞানবান হওয়। প্রাপ্তবয়য় বা বালিগ হওয়া। ই'তিকাফ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এ জন্য জ্ঞানবান অপ্রাপ্ত বয়য় বালক-বালিকার ই'তিকাফও সহীহ্ হয়, য়েমনিভাবে তালের নামায় ও রোয়া নুরস্ত হয়।
- ৬. নারী-পুরুষ সকলের জানাবাত বা গোসল ফর্ম হয় এমন অপবিত্রতা থেকে এবং নারীদের হায়িয় ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও বাদায়েউস সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফের নিয়ম

ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। সুতরাং রমযানে হোক, অথবা রমযান হাড়া অন্য সময়ে—সর্ববিস্থায় এই প্রকার ই'তিকাফের মধ্যে রোষা রাখা জক্তবী।

কেউ যদি একদিন ই'তিকাফ করার মানত করে তবে তার উপর শুধু দিনের ই'তিকাফই ওয়াজিব হবে। সূতরাং সে সুবহে সাদিকের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং সূর্যান্তের পর বের হবে। আর যদি সে ই'তিকাফের মানত করার সময় রাতসহ নিয়ত করে থাকে, তবে রাতও অন্তর্ভুক্ত হবে (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

কেউ যদি নির্দিষ্ট দিনের বা কোন নির্দিষ্ট তারিখের ই'তিকাফের মানত করে তবে তাকে ঐ নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখেই তা আদায় করতে হবে। শর্মী ওয়র ব্যতীত তা আদায়ে বিলম্ব করা জায়েয় নয়। অবশ্য ওয়র থাকলে জায়েয় হবে। কেউ যদি মানত করে যে, সে রাতে ই'তিকাফ করবে, তাহলে তার মানত সহীহ্ হবে না। কেননা মানতের ই'তিকাফের জন্য রোয়া রাখা শর্ত। আর রাত রোয়া রাখার সময় নয় (বাহকুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

কেউ যদি একদিনের ই'তিকাফের মানত করে তবে তার উপর তথু দিনের ই'তিকাফ-ই ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ একদিনের ই'তিকাফের মানত করে এবং দিন-রাত উভয়ই নিয়ত করে তবে তার উপর একদিন একরাতের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে।

কেউ যদি নুই তিন বা ততোধিক দিনের ই'তিকাঞ্চের মানত করে তবে দিন-রাত উভয় সময়ের-ই ই'তিকাফ করতে হবে

যদি কেউ এই মানত করে হে, দুই বা তিন অথবা এরচেয়ে বেশি সংখ্যক রাতে ই'তিকাফ করতে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য শুধু রাতই হয়ে থাকে, তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি রাত বলে তার উদ্দেশ্য রাতসহ দিনও হয়ে থাকে, তবে দিন-রাত উভয়েরই ই'তিকাফ করতে হবে। (আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড ও শামী, ২য় ২ও)।

রমযানুল মুবারকের নিশা তারিখা আসরের পর সূর্যান্তের পূর্বে শেষ দশকের ই'তিকাজের নিয়ত করে ই'তিকাজকারী মসজিদে প্রবেশ করবে, শরয়ীভাবে ঈদের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে ই'তিকাফ খতম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মিরকাত শরহে

মিশকাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে— চার ইমামের সকলেরই এ মত যে, একমাস ই'তিকাফ করার ইচ্ছা থাকুক বা দশদিন উভয় অবস্থায়ই ই'তিকাফকারী ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে আগের দিন সূর্যান্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে (মিশকাত, ৪র্থ খণ্ড)।

মহিলাগণ নিজেদের ই'তিকাফের স্থানে এবং পুরুষগণ মসজিদে প্রবেশ করার সময় অথবা প্রবেশ করে মনে মনে এরপ নিয়ত করবে যে, আমি আক্লাহ্র স্ভুষ্টির জন্য রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিনের সুন্নাত ই'তিকাফ গুরু করছি।

সুনাত ই'তিকাফের নিয়ত বিশ তারিখ রমযান সূর্যান্তের পূর্বেই করতে হবে। যদি সূর্যান্তের পর নিয়ত করা হয়, তবে এ ই'তিকাফ সুনাত থাকবে না, বরং নফল হয়ে যাবে। কেননা, নিয়ত করার পূর্বে শেষ দশদিনের কিছু অংশ এ রূপ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যেখানে ই'তিকাফের নিয়ত করা হয়নি। সূতরাং পুরো দশদিনের ই'তিকাফ হয়নি।

নফল ই'তিকাফ বলা হয়, যে ই'তিকাফের মধ্যে দিন বা সময়ে কোন নির্ধারিত সীমা থাকে না। অর্থাৎ ওয়াজিব ও সুনাত ই'তিকাফ ব্যতীত যে পরিমাণ সময়ের জন্যই হোক, তা নফল ই'তিকাফ।

নফল ই'তিকাফের জন্য এরপ নিয়ত করবে ঃ হে আল্লাহ্! যতটুকু সময় আমি এ মসজিদে থাকব, ততটুকু সময়ের জন্য ই'তিকাফের নিয়ত করছি। আর তথু মনে মনে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে, মুখে বলা জরুরী নয় (বাহরুর রাইক)।

যদি দশদিনের কম সময়ের নিয়ত করা হয় তবে তা নফল ই'তিকাফ হয়ে যাবে। নফল ই'তিকাফ বছরের যে কোন সময়েই করা যায়। তবে রমযান শরীফে করলে সাওয়াব বেশি হয়। যদি কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে ই'তিকাফেরও নিয়ত করে, তবে সে ই'তিকাফেরও সাওয়াব পাবে।

ই'তিকাফের আদাবসমূহ

- ১. অহেতুক কথা না বলা। যথাসম্ভব পুণ্যের আলোচনায় মশগুল থাকা।
- ২. উত্তম মসজিদ নির্বাচন করা। যেমন, মসজিদে হ'রাম বা জামে মসজিদ ইত্যানি।
 - ৩. বেশি বেশি করে কুরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফ পাঠ করা।
 - 8. যিক্র করা।
 - ৫, ইল্মে দীন শিক্ষা করা।
 - ৬. ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়া।
 - ৭. সীরাতুনুবী (সা) অধ্যয়ন করা :
 - ৮. আয়য়য় এবং আউলয়য়য়ে কেরায়ের জীবনী পাঠ করা।
 - ৯. শরয়ী আহকামের কিতাবাদি পাঠ ও রচনা করা :
- ১০. যে সব কথায় গোনাহও নেই এবং সাওয়াবও নেই, অর্থাৎ মোবাহ্ কথা প্রয়োজন ছাড়া না বলা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, শামী ২য় খণ্ড ও মারাকিল ফালাহ)।

যে যে কারণে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি শর্মী প্রয়োজন এবং মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। শর্মী প্রয়োজন যেমন— জ্মু'আর সালাতের জন্য বের হওয়া। মানবীয় প্রয়োজন যেমন— মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য যাওয়া। মহিলাগণ যদি ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে ঘরের অন্যত্র যায় তবে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর অল্প সময় মসজিদের বাইরে থাকলেও ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভূলে বের হলেও এ হকুম প্রযোজ্য হবে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

কিছুক্ষণের জন্য বের হয় সে ক্ষেত্রে ইমাম আবৃ হানীফা (র)-এর মতে তার ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া, ১ম খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ই তিকাফকারী ব্যক্তি রোগীর শুক্রমা করার জন্য মসজিন থেকে বের হবে না। তবে কেউ যদি ই তিকাফের মানত করার সময় রোগীর শুক্রমা, জানাযার নামায এবং ইল্মের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার শর্ত করে নেয়, তবে তার জন্য এ কাজগুলো জায়েয় আছে (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ন্ত্রী সংগম বা এর আনুষন্ধিক কার্যাবলী যেমন চুম্বন, স্পর্শ, আলিঙ্গন ইত্যাদি কাজসমূহ করা ই'তিকাফ অবস্থায় হারাম। ন্ত্রী সঙ্গমে বীর্যপাত হউক বা না হউক ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত হোক, দিনে হউক বা রাতে হউক সর্বাবস্থায় ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আনুষন্ধিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বীর্যপাত হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে, অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। চিন্তা বা দৃষ্টি দেওয়ার কারণে যদি বীর্যপাত হয় বা কারো স্বপুদোষ হয় তবে এর ন্বারা ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ওধু বেহুঁশী বা পাগল হওয়াতে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না। তবে এ অবস্থায় যদি একাধিক দিবস অভিবাহিত হয় তবে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফ অবস্থায় যদি কোন মহিলার মাসিক এসে যায়, তবে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে (বাদায়েউস সানায়ে, ২য় খণ্ড)।

উপরে বর্ণিত কারণসমূহের দ্বারা ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে গেলে তা পরবর্তীতে যথানিয়মে কাযা করে নিতে হবে।

ই তিকাফকারীর জন্য জায়েয কাজসমূহ

- ১. মসজিদে পানাহার করা,
- ২. মসজিদে নিদ্রা যাওয়া,
- ৩. মসজিদের মিনারায় আরোহণ করা। মসজিদের মিনারা যদি মসজিদের অংশবিশেষ হয় তাহলে সকল ই'তিকাফকারীর জন্য তাতে আরোহণ করা জায়েয়।

আর যদি মিনারা মসজিদের অংশ না হয় তাহলে সেখানে ওৎু মুয়ায্যিন ই'তিকাফকারী আয়ানের জন্য আর্নেহণ করতে পারবেন। অন্য ই'তিকাফকারীদের জন্য আরোহণ করা জায়েয় নয়

- 8. ই'তিকাফকারীর মাথা ধৌত করার জন্য মসজিদ থেকে মাথা বের করা।
- ৫. মসজিদে ওয় বা গোসল করার ছারা হদি মসজিদ অপবিত্র বা ময়লায়ুড়
 হওয়ার অশংকা না থাকে তবে মসজিদে ওয় বা গোসল করা (আলমগীরী, ১য়
 বঙ)।
- ৬. ই'তিকাফকারীর জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়-বিক্রয় কর' তবে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্য মসজিদে প্রবেশ করানো জায়েয় নয় (শায়ী, ২য় ২ও)।
 - ৭, ই'তিকাফকারীর বিবাহ করা,
- ৮. ই'তিকাফকারীর জন্য সুগদি ব্যবহার করা এবং মাথায় তৈল লাগানো জায়েহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

ই'তিকাফকারীর জন্য নাজায়েয কাজসমূহ

- ব্যবসার উদ্দেশ্যে মসজিনে ক্রয়-বিক্রয় করা ।
- ২. ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু মসজিনে উপস্থিত করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন কর
- ৩. ই'তিকাফ অবস্থায় কথা না বলাকে ইবাদত মনে করে নিরব থাকা, তবে গোনাহজনিত কথা পরিহার ওয়াজিব (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী ২য় খণ্ড) :

ই'তিকাফ অবস্থায় মজুরি নিয়ে কোন কজে করা মাকরহ। এক্ষেত্রে যেসব কাজ মসজিদে মাকরহ ঐ সব ক'জ মসজিদের ছাদে করা মাকরহ (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফকারীর জন্য জুমু'আর সালাতে অংশগ্রহণ

পাঞ্জেগানা মসজিদে ই'তিকাফকারী ব্যক্তি জুমু'আর নামায় আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজ মসজিদ থেকে বের হয়ে নিকটবর্তী জুমু'আর মসজিদে গিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারবে।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি জুমু'আর মসজিদে গিয়ে ফর্যের পূর্ববর্তী স্নাত, খৃত্বা, জুমু'আর ফর্য আদায় এবং জুমু'আর ফর্যের পরবর্তী ছর রাকাআত সুনাত আনায় করা পরিমাণ সময়, পর্যন্ত জুমু'আর মসজিদে অবস্থান করতে পরবে। উপরোজ উদ্দেশ্যে জুমু'আর মসজিদ নিকটবর্তী হলে যাওয়ালের পরে এবং দূরবর্তী হলে এতটুকু সময় পূর্বে নিজ মসজিদ থেকে বের হবে যেন ফর্যের পূর্ববর্তী সুনাত আদায় করা যার এবং খুত্বা শোনা যায়। পাঞ্জোনা মসজিদে ই'তিকাফকারী ব্যক্তি যদি জুমু'আর মসজিদে নমায় আদায় করতে গিয়ে নামায় আনারের পরেও সেখানে অবস্থান করে তবে তাতে ই'তিকাফ ফাদিদ হবে না। এমনকি যদি ঐ জুমু'আর মসজিদে একদিন একরাত অবস্থান করে অথবা ঐ জুমু'আর মসজিদে অবস্থান করে অথবা ঐ জুমু'আর মসজিদে অবস্থান করে অথবা ঐ জুমু'আর মসজিদে অবস্থান করে তাতেও ই'তিকাফ ফাদিদ হবে না। তবে প্রয়োজন ব্যতীত এরপ করা মাকরহ তানযীহ (আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও শামী, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফকারীর জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ

ই'তিকাফকারী রোগী দেখতে অথবা জানাযার সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। তবে নফল ই'তিকাফকারী রোগী দেখার উদ্দেশ্যে অথবা জানাযার সালাতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। যদি কোন ই'তিকাফকারী ব্যক্তি কোন বৈধ কাজ যেফন—মানবীয় প্রয়োজন অথবা জুমু'আর সালাতের জন্য বের হওয়ার পর পথে কোন রোগী দেখে নেয় অথবা উপস্থিত জানাযার সালাত কোন রোগী দেখতে গেল অথবা জানাযার সালাত আদায় করে নেয় তবে তা জায়েয় (শামী, ২য় ২ণ্ড)।

কেউ যদি ই'তিকাফের মানত করার সময় এ নিয়ত করে যে, সে ই'তিকাফ অবস্থায় রোগী দেখতে যাবে, জানাযার সালাত আদায় করতে যাবে এবং ইল্মী মজলিসে উপস্থিত হবে তবে তার জন্য ই'তিকাফ অবস্থায় এ কাজসমূহের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয (শামী ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

যে সব কারণে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারেন

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি তিন ধরনের প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে পারেন। যেমন ঃ

- ১. শর্মী প্রয়োজন্
- ২. মানবীয় প্রয়োজন্
- ৩. একান্ত অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি শরয়ী প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। যেমন, জুমু'আ ও দুই ঈদের নামায়। মিনারার দরজা মসজিদের বাইরে থাকলেও ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মিনারায় গিয়ে আযান দেওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে (শামী, ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি এমন সব মানবীয় প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যেতে পারবে, যে কাজগুলো একান্ত প্রয়োজন এবং তা মসজিদে বসে করাও যায় না। যেমন—মলমূত্র ত্যাগ করা এবং ফর্য গোসল আদায় করা।

একান্ত অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনেও ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। যেমন—মসজিদ বিধান্ত হয়ে গেলে, জালিম ব্যক্তি ই'তিকাফকারী ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দিলে অথবা কোন অত্যাসারীর কারণে নিজের জান অথবা মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই অন্য মসজিদে ই'তিকাফের জন্য চলে যাবে (মারাকিল ফলাহ)

ই'তিকাফ ফাসিদ হলে তার হুকুম

যে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যায় তা ওয়াজিব ই তিকাফ হলে সক্ষম হওয়ার পর এর কাষা করতে হবে। ই'তিকাফ কাষা করার সঙ্গে সঙ্গে রোয়াও কাষা করতে হবে। যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের ই'তিকাফের মানত করা হয় তবে যে কয়দিনের ই'তিকাফ ছুটে গেছে সে কয়দিনের ই'ভিকাফের কাযা করতে হবে। প্রথম থেকে নতুন করে পুনরায় কাযা করতে হবে না। যদি কেউ নির্দিষ্টভাবে কোন মাসের ই'ভিকাফের মানত করে অতঃপর কোন একদিনের ই'ভিকাফ ভেঙ্গে ফেলে, তবে নতুন করে পুনঃ একমাসের ই'ভিকাফ কাযা করতে হবে। উল্লিখিত উভয় অবস্থাতে চাই বিনা ওযরে নিজের কাজের মাধ্যমে ই'ভিকাফ ভঙ্গ হোক যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া হোক, অসুস্থ হয়ে মসজিদ থেকে বের হতে বাধ্য হওয়া অথবা ব্যক্তির কোন ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভঙ্গ হোক যেমন মহিলাদের ঋতুস্রাব হওয়া—উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

কেউ যদি নাউযুবিল্লাহ মুরতাদ হয়ে যায় এবং এরপর তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে তার জন্য পূর্ব বাতিলকৃত ই'তিকাফের কায়া করতে হবে নাঃ

কোন ব্যক্তি মানতের ই'তিকাফ পালনকালে পাগল হওয়ার কারণে যদি তার ই'তিকাফ ভঙ্গ হয় এবং তা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে তাহলে যখনই সুস্থ হবে তখনই তাকে রোযা সহ ই'তিকাফের কাযা করতে হবে।

নফল ই'তিকাফ যদি কেউ একদিন পূর্ণ হওয়ার আগেই ভেঙ্গে দেয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না

মানতের ই'ভিকাফ যদি ছুটে যায়, তবে হয়তো তা নির্দিষ্ট মাসের মানত হবে, অথবা অনির্দিষ্ট মাসের। নির্দিষ্ট মাসের কিছু অংশের ই'ভিকাফ যদি ছুটে যায় তবে সেই অংশের ই'ভিকাফ পূর্ণ করলেই চলবে। নতুন করে সবগুলো পালন করার প্রয়োজন নেই। কিছু নির্দিষ্ট মাসের সবগুলোই যদি নির্ধারিত সময় থেকে ছুটে যায় তবে সবগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা জরুরী। উক্ত ব্যক্তি যদি কাষা না করে এবং জীবন প্লেকে নিরাশ হয়ে যায়, তবে উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যে তার এই ওসীয়ত করা ওয়াজিব যে, তারা যেন প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে দুবলা খাবার দান করে।

উল্লেখ্য, এই ফিদ্য়া রোযার কারণে দিতে হচ্ছে। যেমন, রমযানের রোযার পরিবর্তে দিতে হয়। আর যদি উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট মাসের এক অংশের কায়া করে এবং অপর অংশের না করে তবু উল্লিখিত হকুম। তবে শর্ত হলো মানতের সময় সে ব্যক্তি সুস্থ হতে হবে। আর যদি মানতের সময় সে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে থাকে এবং অসুস্থ অবস্থায়-ই নির্ধারিত সময় চলে যায় এবং তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়। কিছু যদি নির্দিষ্ট কোন মাসের মধ্যে নয়, বরং অনির্দিষ্টভাবে করে থাকে, তাহলে পুরো জীবন-ই তার সময়। যে কোন সময়ই সে পালন করুক, তা কায়া হবে না, বরং আদায় করা হয়েছে বলা হবে (বাদায়েউস্ সানায়ে):

রমযানের শেষ দশদিনের ই'তিকাফ সুনাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। এ ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী। এই ই'তিকাফ শুরু করার পর ভঙ্গ করে দেওয়া হলে অথবা ভঙ্গ হয়ে গেলে, যে কয়দিনের ছুটে গেছে রোযাসহ সে কয়দিনের কাযা জরুরী। কিন্তু একদিনের ছুটলেও রমযানের পর সতর্কতামূলক পুরো দশদিনের কাযা করে নেওয়া উত্তম (শামী, ২য় খণ্ড)।

লাইলাতুল কাদ্রের ফযীলত ও তাৎপর্য

পবিত্র কুরআনে লাইলাতুল কাদরের ফ্যালত সম্পর্কিত একটি পরিপূর্ণ সূরা রয়েছে। সূরাটির নাম 'সূরা আল-কাদ্র'। সূরাটিতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

انًا ٱنْزَلْنهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مَنْ ٱلْفِ شَهُر تَنَزَلُ الْمَلئكَةُ وَالرَّوْجُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبَّهُمْ مِنْ كُلَ ٱمْرٍ سَلَمُ هَى حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কাদ্র—মহিমান্তি রজনীতে। আর মহিমান্তি রজনী সম্বন্ধে আপনি জানেন ? লাইলাতুল কাদ্র বা মহিমান্তি রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশ্তাগণ ও রহ (হযরত জিব্রাঈল (আ)) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি সেই রজনী, সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

এ স্রাটির শানে নুযুল সম্পর্কে বিখ্যাত মুফাস্সির হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স:) বনী ইসরাঈলের একজন মুজাহিদের অবস্থা উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি লাগাতার এক হাজার মাস পর্যন্ত জিহাদে মশগুল ছিলেন। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই আক্র্যাম্থিত হলেন। তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এ সূরয় এ কথা প্রতীয়মান হয় য়ে, এ রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম (মা আরিফুল ক্রআন)।

এই মহিমান্তি রজনীকে 'লাইলাতুল কাদ্র' নামে অভিহিত করার তাৎপর্য কী ? এ সম্পর্কে সহীহ্ মুদলিম শরীফের টীকাকার ইমাম নববী (র) লিখেছেন, এ রাতের নাম 'লাইলাতুল কাদ্র' এই জন্য রাখা হয়েছে যে, কাদ্র মানে তক্দীর বা ভগ্য। আর এই রাতে মানুষের পরবর্তী এক বছরের তক্দীর বা ভাগ্য, রিষিক, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কর্তব্যরত ফেরেশতাদের কাছে ন্যস্ত করা হয়। অথবা কাদ্র মানে সম্মান ও মর্যাদা। আর যেহেতু এ রাতের সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি, তাই এই রাতকে 'লাইলাতুল কাদ্র' বলা হয় (মুসলিম)।

আবৃ বকর ওয়াররাক বলেছেন, কাদ্র মানে সম্মান ও মর্যাদা। এই রাতকে লাইলাতুল কাদ্র' এই জন্য বলা হয় যে, পূর্ববতী জীবনে আমল না করার কারণে যে মানুষের কোন সম্মান বা মর্যাদাই ছিল না, সেও এই রাতে তাওবা ইস্তিগ্ফার এবং ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে (মা'আরিফুল কুরআন)।

লাইলাতুল কাদ্রের ফযীলত সম্পর্কে বহু হানীস বর্ণিত রয়েছে। হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পিছনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরের রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকে তার পিছনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় (বুখারী)।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ লাইলাতুল কাদ্রে জিব্রাঈন (আ) একদল ফেরেশ্তা নিয়ে অবতরণ করেন এবং নাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় যারা আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল তাদের জন্য রহমতের সু'আ করেন।

'লাইলাতুল কাদ্র' কোন্ রাত এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। উন্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাস্লুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা লাইলাতুল কান্র অনুসন্ধান কর রমযানের শেষ দশকের বিজ্ঞাড় রাত্রিতে (মিশকাত)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদ্র অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন রমযানের শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করে (মুসলিম)।

যির ইব্ন হ্বাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলে থাকেন, যে ব্যক্তি সারা বছর রাত জেগে ইবাদত করবে সে 'লাইলাতুল কাদ্র' পাবে। (এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?) তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা আলা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদের উপর রহম করুন তিনি চাচ্ছেন মানুষ যেন সারা বছর লাইলাতুল কাদ্র পাওয়ার আশায় রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকে। অথচ তিনি তো অবহিত রয়েছেন যে, লাইলাতুল কাদ্র রমযানেই হয়ে থাকে এবং তা রমযানের শেষ দশকেই রয়েছে এবং তা অবশ্যই রমযানের সাতাশতম রাতে। এরপরে তিনি শপথ করে দ্বার্থহীন ভাষায় বললেন, তা সাতাশতম রজনীতেই (মুসলিম)।

মোটকথা, লাইলাতুল কাদ্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে রমযানের শেষ দশকের রোযার রাতসমূহে ইবাদতে মশগুল থাকা বাঞ্ছ্নীয়। তবে সাতাশতম রাতের ব্যাপারে নির্দিষ্ট রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় এবং এ মোতাবেক উন্মতের আমল জারি রয়েছে।

লাইলাতুল কাদ্রের আমল

লাইলাতুল কাদ্রের আমল সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে—
তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, ইয়া রাস্লাল্লাহ্! যদি আমি
লাইলাতুল কাদ্র পেয়ে যাই তবে সে রাতে আমি কী দু'আ করব ? উত্তরে রাস্লুল্লাহ্
(সা) বললেন, তুমি বলবে ﴿ وَمَا عَنْ وَاعَالَهُ مَا الْكُورُ وَاعَالَهُ الْكُورُ وَاعَالَهُ الْكُورُ وَاعَالَهُ الْكُورُ وَاعَالَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

এ রাতের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন ইবাদতের উল্লেখ নেই। তবে যেহেতু রাতটি খুবই মহিমানিত তাই এ রাতে বেশি বেশি করে নফল নামায, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, দরদ, তানবীহ্-তাহ্লীল, যিকির-আযকার, দান-খয়রাত, তাওবা ইসতিগৃফার করবে।

ইফা-২০১১-২০১২ প্র/ ৯৬৩৭-১০২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত কয়েকটি বই

- পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- 🏇 কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- 🌞 জিহাদ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- 🖈 শিরুক-কুফর-বিদ'আত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- नामात्यत माम्याला-मामात्यल
- ওয়াকফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- জানাযা ও দাফন-কাফনের মাসআলা-মাসায়েল
- অপরাধ ও শান্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল
- 🆗 যাকাত ও সাদাকার মাসআলা-মাসায়েল
- 🐇 বিচার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

